# বেঙ্গল টাইমস

১৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা

ISSN 2445 5657

bengaltimes.in

# সূচিপত্র


## রাজনীতি

বিকল্পের কোনও পরিশ্রম নেই
❑ সরল বিশ্বাস

আসল পাল্টিবাজ তাহলে কারা?
❑ রজত সেনগুপ্ত

ওই ফলকটা হয়তো ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়াল
❑ প্রশান্ত বসু

অর্থমন্ত্রী ক্যাবিনেটেই নেই! এর নাম সরকার
❑ স্বরূপ গোস্বামী

## স্পেশ্যাল ফিচার

সরস্বতী পুজোয় কিন্তু গোপনে সিগারেটেরও হাতেখড়ি
❑ মিলন মুখোপাধ্যায়

নামেই অরন্ধন, আসলে মহারন্ধন
❑ অন্তরা চৌধুরি

## ওপেন ফোরাম

হ্যাঁ, রাজ্যসভা শমীকবাবুদেরই জায়গা
❑ অজয় কুমার

একটা পাতাও ওরা পড়তে পারছে না
❑ অভিজিৎ পাল

## বিনোদন

সাক্ষাৎকার: উর্মিমালা বসু
❑ সংহিতা বারুই

## ভ্রমণ

জঙ্গলের মাঝে আস্ত এক বিমানবন্দর!
❑ অভিজিৎ দে

পাহাড় যেন সবকিছু ফিরিয়ে দিল
❑ শান্তনু পাঁজা

স্নিগ্ধ গ্রাম কোলাখাম
❑ সুব্রত মণ্ডল

## খেলা

কোয়েস-ইমামি বুঝি সর্বহারা!
❑ ময়ূখ নস্কর

রক্ত দিতে এগিয়ে এসেছিলেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল
❑ ধীমান সাহা

তিনি বাঁচেন নিজের মর্জিতেই
❑ অজয় নন্দী



**ISSN 24455657**

**bengaltimes.in**

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন ২৪৪৫ ৫৬৫৭, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

**সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী**

সম্পাদকীয়

# স্মৃতির সরণি বেয়ে

শীত যেন যাই যাই করছে। বইমেলা আগেই শেষ। এবার দুয়ারে কড়া নাড়ছে সরস্বতী পুজো। একইদিনে আবার ভ্যালেন্টাইন্স ডে। অর্থাৎ, বাঙালির প্রেম দিবস আর আন্তর্জাতিক প্রেম দিবস মিলেমিশে একাকার। আমাদের অনেকের ছোটবেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে সরস্বতী পুজোর নানা টুকরো টুকরো স্মৃতি। এই একটা পুজো কিশোরদের হঠাৎ করে কিছুটা যেন সাবালক করে তোলে। সেইসব দিনের নস্টালজিয়ায় ভাসতে কার না ভাল লাগে!

এদিকে, ভোটের দামামা বাজতে আর দেরি নেই। রাজনৈতিক তরজা সারাবছরই লেগে থাকে। ভোটের আগে তা আরও নিম্নগামী হয়ে ওঠে। সন্দেশখালি নিয়ে এর মধ্যেই রাজ্য রাজনীতি বেশ উত্তপ্ত। প্রশাসন বছরের পর বছর অপরাধীদের পক্ষ নিলে একটা সময়ের পর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে মানুষ নিজের হাতেই আইন তুলে নেয়। সেই বার্তাই যেন দিয়ে যাচ্ছে সন্দেশখালি।

অন্যদিকে, সিবিআই-ইডি যথারীতি শীতঘুমে। নিচুতলায় দু-এক জায়গায় হানা, দু-একজন ধরপাকড়। কিন্তু আসল পান্ডারা সুরক্ষিত। উল্টে তারা যেন অপরাধের প্রমাণ লোপাট করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করাই যেন এইসব কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আচ্ছা, সিবিআই-ইডি কি নিজের ইচ্ছেয় শীতঘুমে যায়! কারা তাদের শীতঘুমে পাঠান, এরপরেও বুঝতে কোনও বাকি থাকে?

# বিকল্পের কোনও পরিশ্রম নেই

## সরল বিশ্বাস

শিরোনামটা দেখে ঘাবড়ে যাওয়ারই কথা। মনে হতেই পারে, নির্ঘাত ভুল টাইপ হয়েছে। এতকালের চেনা প্রবাদের সঙ্গে তো মিলছে না।

এ যেন খেলার আগেই হার স্বীকার করে নেওয়া। কয়েক মাস আগেও ঘটা করে যে ইন্ডিয়া জোটের কথা শোনা যেত, এখন আর সেভাবে শোনা যায় না। কোনও কোনও রাজ্যে হয়তো আসন সমঝোতা হবে। নাম কে ওয়াস্তে দু-একটা সভাও হবে। কিন্তু বিজেপি-র বিরুদ্ধে যে ঐক্যবদ্ধ লড়াই ছুড়ে দেওয়া যাবে না, সেই দেওয়াল লিখন এর মধ্যেই পরিষ্কার হয়ে গেছে।

গণতন্ত্রের স্বার্থেই শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা খুব জরুরি। বিরোধীরা শক্তিশালী থাকলে সরকার যেমন কিছুটা সতর্ক থাকে। জনসমর্থন হারানোর ভয় থাকে। তেমনি জনগণের সামনেও বিকল্প থাকে। সরকারকে সরাতে চাইলে তাঁরাও বিকল্প বেছে নিতে পারেন। কিন্তু বিরোধীরা একে দুর্বল, তার ওপর ছত্রভঙ্গ। ফলে, জনতা কাদের ওপর ভরসা করবে?

নানা আঞ্চলিক দল। তাদের নানা রকম স্বার্থ জড়িয়ে আছে। একেক রাজ্যে একেক রকম সমীকরণ। এইসব দলগুলির এক ছাতার তলায় আসা এমনিতেই কঠিন। তামিলনাড়ুতে যেমন ডিএমকে-এআইএডিএমকে-র এক ছাতার তলায় আসা সম্ভব নয়। বাংলায় তেমনি বামফ্রন্ট-তৃণমূলেরও এক ছাতার তলায় আসা সম্ভব নয়। তাছাড়া, কংগ্রেস শক্তিশালী হলে তাকে কেন্দ্র করে আঞ্চলিক দলগুলির একটি জোট হতে পারত। কিন্তু কংগ্রেস দুর্বল হলে আঞ্চলিক দলগুলি উল্টে কংগ্রেসকেই আরও চাপে রাখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কংগ্রেসের জমিদারি মানব না, এটাই যেন অলিখিত স্লোগান হয়ে দাঁড়ায়। এই পারস্পরিক অবিশ্বাসের আবহে জোট হওয়া সত্যিই বেশ কঠিন।

আরও একটি কারণ, এই আঞ্চলিক দলগুলির অধিকাংশই কোনও না কোনও সময়ে বিজেপির শরিক ছিল। বাম ও লালু প্রসাদ যাদব ছাড়া কোনও দলেরই সেই রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা নেই। এঁরা প্রায় সবাই নানা সময়ে বিজেপির সঙ্গে ছিলেন। এখনও বিজেপি-র সঙ্গে তেমন আদর্শগত বিরোধ নেই। নেহাত বিজেপি শিবিরে পাত্তা পাচ্ছেন না, তাই এদিকে আছেন, এমন দলের সংখ্যাও কম নয়। আগামীদিনে প্রয়োজন পড়লে আবার বিজেপি শিবিরে নৌকো

ভিড়িয়ে দিতেই পারেন। নীতীশ কুমার তো আগেই সরে পড়লেন। আরও কারও কারও সরে পড়া সময়ের অপেক্ষা।

তাহলে বিজেপির সঙ্গে লড়াইয়ের কোনও উপায়ই কি ছিল না? ওয়াক ওভার দেওয়াই কি অনিবার্য নিয়তি ছিল? এইমুহূর্তে যা অবস্থা, তাতে বিজেপি-কে হারানো হয়তো কঠিন। তবে ঠিকঠাক লড়তে পারলে একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া যেত। জোট যদি করতেই হত, সেই প্রক্রিয়া অনেক আগে শুরু করা দরকার ছিল। অন্তত পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পর থেকেই নেমে পড়া যেত। শুধু লোক দেখানো কয়েকটা বৈঠক, পাশাপাশি বসে ফটোসেশন। এগুলো যথেষ্ট নয়। এতে প্রচার হয়। ছবি ওঠে। সমন্বয় গড়ে ওঠে না। তাছাড়া, একটা বৈঠকের পরের বৈঠক তিন মাস পর। আগের বৈঠক কবে হয়েছে, লোকে ভুলেই গেছে।

বৈঠকের নির্যাস কী? গোটা কয়েক প্রেস কনফারেন্স। এই লড়াইকে মঞ্চেও আনা গেল না। রাস্তায় নামানো তো অনেক দূরের কথা। বিভিন্ন দলের কর্মীরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাঁটবেন, একসঙ্গে আন্দোলনে নামবেন, সেই পরিস্থিতি পর্যন্ত গড়ালই না। সবার চোখ আসন সমঝোতায়। একদিকে কংগ্রেস চাইল, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা ভোট পর্যন্ত বিষয়টাকে ঝুলিয়ে রাখতে। তাঁরা ভেবেছিলেন, এই চারটের মধ্যে যদি তিনটেয় সরকার হয়ে যায়, তাহলে তাঁরাই হবেন জোটের চালিকাশক্তি। তাঁরাই আসনরফা চূড়ান্ত করবেন। বাকিরা সেটা মেনে নেবেন। অন্যদিকে, আঞ্চলিক দলগুলি ভাবল, ওই চার রাজ্যে ভাল ফল হলে, কংগ্রেস কাউকে পাত্তাই দেবে না। তাই এই সুযোগে কংগ্রেসকে চাপে রেখে আসন সমঝোতা হয়ে যাক। ফল কী হল? তিন রাজ্যে কার্যত ভরাডুবি। জোটে আরও যেন কোণঠাসা হয়ে পড়ল কংগ্রেস।

যেমন, বাংলার কথাই ধরা যাক। তৃণমূলের সঙ্গে জোট হবে কিনা, কংগ্রেসকর্মীরা আগাগোড়াই ধোঁয়াশায় রইলেন। এমনকী রাজ্য সভাপতি অধীর চৌধুরি পর্যন্ত ধোঁয়াশায় রইলেন। না তৃণমূলের পাশে দাঁড়ানো যাচ্ছে, না আক্রমণ করা যাচ্ছে। বামেদের ক্ষেত্রে তৃণমূলের সঙ্গে জোটের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে জোট নিয়ে ধোঁয়াশা। কারণ, তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হলে, বামেদের একাই লড়তে হত। আবার তৃণমূল-কংগ্রেস জোট না হলে বাম-কং জুটি হতে পারে। আগে থেকে ছবিটা পরিষ্কার হলে অন্তত বাম-কং জোটকে আরও আগে থেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। এতে বিজেপি বিরোধী সংখ্যালঘু শিবিরে যেমন কিছুটা আস্থা অর্জন করা যেত, তেমনই তৃণমূল বিরোধী ভোটারদের বিজেপিমুখী স্রোত একটু হলেও আটকানো যেত। বেশ কিছু যৌথ কর্মসূচি হতে পারত। এতদিনে আসনরফাও চূড়ান্ত হয়ে যেতে পারত। গোটা ব্যাপারটা অহেতুক ঝুলে রইল। কেন সীতারাম ইয়েচুরি মমতার সঙ্গে মিটিং করলেন, এই অভিযোগের জবাব

দিতে দিতেই রাজ্য নেতাদের কয়েক মাস কেটে গেল। এই সুযোগটাই নিল বিজেপি। নীচুতলায় যাঁরা সত্যিকারের তৃণমূল বিরোধী, তাঁদের মধ্যেও বামেদের তৃণমূল বিরোধী অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হল।

শাসকদলের কোন ইস্যুকে কীভাবে কাউন্টার করা হবে, কোন ইস্যুটাকে উপেক্ষা করা হবে, এই রণনীতি তৈরিই করা গেল না। ফলে, একদিকে মোদি যখন রাম মন্দিরের হাওয়া তুলছেন, বিরোধীরাও মন্দিরে যাওয়া শুরু করে দিলেন। কে কত রামভক্ত, তা প্রমাণ করার যেন হিড়িক পড়ে গেল। ফলে, বিজেপি যে হাওয়ায় দেশকে ভাসাতে চেয়েছিল, বাকিরাও যেন তাতে পালে হাওয়া দিল। বিরোধীরা কী কর্মসূচি নেবে, তার নিয়ন্ত্রক যেন বিজেপি।

সহজ কথা, জোট করতে গেলে, যে আন্তরিকতা দরকার, তা কোনও পক্ষেরই ছিল না। যে আত্মত্যাগ দরকার, তার জন্যও কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। যে বিশ্বাসযোগ্যতা দরকার, তাও অধিকাংশ দলেরই নেই। মোদ্দা কথা, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও পরিশ্রম। কোনওটাই ছিল না। আদ্যোপান্ত ফাঁকিবাজি আর ফটোসেশন দিয়ে শাসকদলকে হারানো দিবাস্বপ্নের মতোই।

ছোট থেকেই শুনে আসছি, পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই। বিরোধী জোটের দায়সারা মনোভাব ও কাণ্ড কারখানা দেখেই শিরোনামটা উল্টে দেওয়া। বলতেই হচ্ছে, বিকল্পের কোনও পরিশ্রম নেই।

# অর্থমন্ত্রী ক্যাবিনেটেই নেই! এর নাম সরকার

## স্বরূপ গোস্বামী

আবার একটা রাজ্য বাজেট হয়ে গেল। যথারীতি ধন্য ধন্য রব। কিন্তু আসল প্রশ্নটা এবারও আড়ালেই থেকে গেল। আগে রাজ্য বাজেটের পর অসীম দাশগুপ্ত তার ব্যাখ্যা দিতেন। তিনিই প্রেস কনফারেন্স করতেন। রাজ্যসুদ্ধু লোক জানত, ইনিই রাজ্যের অর্থমন্ত্রী।

গত এক দশকে সেসব পাট চুলোয় গেছে। এখন বাজেটের দিন অর্থমন্ত্রী আর প্রেস কনফারেন্স করতেই পারেন না। মাইক কেড়ে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীই বলে চলেন। বুঝিয়ে দেন, এটা আসলে তাঁরই বাজেট। সবই তাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত। ভূভারতে এমন বাজেট কখনও হয়নি। অর্থমন্ত্রী একজন থাকতে হয়, তাই আছেন। তিনি আসলে কেউ নন। বেচারা অর্থমন্ত্রী! কেমন অসহায়ভাবে পাশে বসে থাকেন! তিনি নামে অর্থমন্ত্রী হলেও তাঁর যে কোনও গুরুত্বই নেই, এই অপমান, এই হেনস্থা তাঁকে প্রতিনিয়ত হজম করতে হয়।

যাক, এবার সেই মোক্ষম প্রশ্নটায় আসা যাক। আচ্ছা, এই রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর নাম কী? রাস্তায়,

বাসে, সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রশ্নটা একবার হাওয়ায় ভাসিয়ে দিন তো। টাটকা বাজেট হল। এক কথাতেই উত্তর আসার কথা। কিন্তু দেখুন, তার পরেও লোকের মনে কতরকম ধোঁয়াশা। কেউ হয়ত এখনও অমিত মিত্রর নাম বলে বসবেন। যাঁরা একটু বেশি জানেন, তাঁরা হয়ত বলবেন, ওটা মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই রয়েছে। হাতে গোনা কেউ কেউ হয়ত বলবেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য।

আচ্ছা, চন্দ্রিমা কি ক্যাবিনেট মন্ত্রী? উত্তর হল, 'না'। তাহলেই ভেবে দেখুন, যিনি বাজেট পেশ করলেন, যাঁর হাতে রয়েছে অর্থ দপ্তর, তিনি ক্যাবিনেট মন্ত্রীই নন। রাজ্যে প্রায় তিরিশজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী আছেন। সেই তালিকায় চন্দ্রিমার নাম নেই। অথচ, তিনি কিনা অর্থমন্ত্রী।

স্বাস্থ্য বা আইন মন্ত্রকও চন্দ্রিমার হাতে রয়েছে। কিন্তু সেখানে তিনি প্রতিমন্ত্রী। অর্থাৎ, স্বাস্থ্যের মূল দায়িত্বে মমতা ব্যানার্জি, প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা। বা আইন দপ্তরের মন্ত্রী মলয় ঘটক, প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা। কিন্তু অর্থদপ্তর কোনও ক্যাবিনেট মন্ত্রীর হাতে নেই। পুরোপুরি চন্দ্রিমার হাতেই রয়েছে। বিশ্বাস না হলে রাজ্য সরকারের ওয়েবসাইটেই দেখে নিন।

উদ্যান পালন থেকে গ্রন্থাগার, পশুপালন থেকে সমবায় রয়েছে ক্যাবিনেটের তালিকায়। জায়গা হয়নি অর্থদপ্তরের মন্ত্রীর। তাহলেই ভেবে দেখুন, কারা চালাচ্ছেন প্রশাসন। ভারতের কোনও রাজ্যে এমন নজির আছে? পৃথিবীর কোনও দেশে আছে কিনা সন্দেহ। এরপরেও সরকারকে ধন্য ধন্য করতে হবে? অর্থমন্ত্রীকে যে অন্তত ক্যাবিনেট মন্ত্রী করতে হয়, এই ন্যূনতম জ্ঞানটুকু যাঁর নেই, তিনি কিনা আইন পাশ করেছেন! তিনি কিনা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী! ভাবতে লজ্জা হয় না?

এত এত আমলা। তাঁদের কারও মনে হল না, এটা করা যায় না! এতজন মন্ত্রী, এত বুদ্ধিজীবী, তারপরেও কেউ এই সুপরামর্শটা দিলেন না! অবাক লাগে বিরোধীদের দেখেও। তাঁদেরও পড়াশোনা, চর্চার মান বড়ই নিম্নগামী। কোন বিষয়টা তুলে ধরতে হয়, কোন বিষয়টা নিয়ে সমালোচনা করতে হয়, এই বোধটুকুও তাঁদের লোপ পেয়ে যায়। রাকেশ রোশন চাঁদে গিয়েছিল কিনা, নজরুল ইসলাম মহাভারত লিখেছিলেন কিনা, এসব নিয়ে খিল্লি করাতেই তাঁদের যত আনন্দ। যেগুলো প্রশাসনের আসল অপদার্থতা ও মূর্খামির দিক, সেগুলো সম্পর্কে এঁরা খবরও রাখেন না। বিজেপির কথা তো না হয় ছেড়েই দিলাম, এমনকী বামেদেরও এই ভয়ঙ্কর অনিয়ম সম্পর্কে সোচ্চার হতে দেখি না।

যেমন সরকার আমাদের প্রাপ্য, আমরা ঠিক তেমন সরকারই পেয়েছি। উল্টোটাও সত্যি। যেমন বিরোধী প্রাপ্য, তেমন বিরোধীও পেয়েছি। মূর্খামির এই বাজার গরম করা প্রতিযোগিতা চলতে থাকুক।

# আসল পাল্টিবাজ তাহলে কারা?

## রজত সেনগুপ্ত

সবথেকে বেশিদিনের মুখ্যমন্ত্রী কে? কুইজে আগে এমন প্রশ্ন আসত। উত্তরটা ছিল জ্যোতি বসু। পরে নিঃশব্দে জ্যোতি বসুকে ছাপিয়ে যান সিকিমের পবন চামলিং। মাস ছয়েক পর চামলিংকেও হয়তো ছাপিয়ে যাবেন ওড়িশার নবীন পট্টনায়েক।

কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে সবথেকে বেশিবার শপথ নিয়েছেন কে? এমন প্রশ্ন এলে উত্তরটা একটু অন্যরকম হতে পারে। এক্ষেত্রে উত্তরটা

হতে পারে নীতীশ কুমার। কারণ, একই টার্মে তিনি একাধিকবার শপথ নিয়েছেন। কখনও রাষ্ট্রীয় জনতা দল ও কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে সরকার গড়েছেন। মাঝপথে সেই সরকার ভেঙে দিয়ে পাড়ি দিয়েছেন এনডিএ শিবিরে। আবার নতুন করে শপথ। সম্প্রতিও তেমনটাই হল। জিতেছিলেন বিজেপি জোটের হয়ে। ভোল বদল করে মাঝপথে এলেন বিরোধী শিবিরে। সেখান থেকে ইউ টার্ন নিয়ে আবার বিজেপি শিবিরে। সকালে ছিলেন বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রী। পদত্যাগ করেই বিকেলে হয়ে গেলেন বিজেপির জোট সঙ্গী। ফের নতুন করে শপথ নিলেন। হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে, এই টার্মেই তিনি তিনবার শপথ নিলেন।

*সকালে ছিলেন বিরোধী জোটের মুখ্যমন্ত্রী। পদত্যাগ করেই বিকেলে হয়ে গেলেন বিজেপির জোট সঙ্গী। ফের নতুন করে শপথ নিলেন। হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে, এই টার্মেই তিনি তিনবার শপথ নিলেন।*

কেউ বলছেন পাল্টিবাজ। কেউ বলছেন পাল্টি কুমার। বারবার শিবির বদলালে এমনটা শুনতে হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একা নীতীশকে দায়ী করে লাভ কী? তিনি পাল্টি মারছেন কার ভরসায়? বিজেপি যদি এভাবে দরজা খুলে না রাখত, এভাবে স্বাগত না জানাত, তাহলে কি তিনি নিজের সরকার ভেঙে আবার বিকেলে অন্য সরকারের শপথ নিতে পারতেন!

গোটা দেশজুড়েই যেন আয়ারাম-গয়ারামের রাজনীতি। যে যখন খুশি, শিবির বদল করছেন। কেউ আর অবাকও হচ্ছেন না। কোনও চক্ষুলজ্জারও দরকার পড়ছে না। কী আশ্চর্য, এটাকেও কেউ কেউ মোদি-অমিত শাহদের জয় হিসেবে দেখাতে চাইছেন। মাত্র দু'মাস আগে অমিত শাহ পাটনায় গিয়ে বলে এসেছিলেন, নীতীশ কুমারের জন্য এনডিএ-র দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। কোনওমতেই আর তাঁকে এনডিএ-তে নেওয়া হবে না। কিন্তু দু'মাস যেতে না যেতেই দেখা গেল, তিনি এনডিএ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফের শপথ নিচ্ছেন। থাপ্পড়টা তাহলে কার গালে লাগল! নীতীশ কুমার অন্তত এটুকু বুঝিয়ে দিলেন, অমিত শাহ আসলে হাতের পুতুল মাত্র। তাঁর কথার কোনও মূল্যই নেই। কয়েক মাস আগে, প্রধানমন্ত্রী বিহারে গিয়ে নীতীশ কুমারের নামে প্রবল আক্রমণ শানিয়ে এলেন। প্রধানমন্ত্রী পদের মর্যাদাটুকুও রাখলেন না। কী আশ্চর্য, তিনিও ফের নীতীশ কুমারকে নিতে রাজি হয়ে গেলেন।

নীতীশকে গালাগাল দেওয়া খুব সহজ। কিন্তু একবার ভাবুন তো, আসল পাল্টিবাজ কারা।

# ওই ফলকটা হয়তো ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়াত

**প্রশান্ত বসু**

একমাসও হয়নি। রাজারহাটে জ্যোতি বসুর নামাঙ্কিত গবেষণা কেন্দ্রের শিলান্যাস হয়ে গেল। সেই কেন্দ্রের শিলান্যাস করার কথা ছিল নীতীশ কুমারের। আসার কথা ছিল কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নেরও। অবশ্য, তাঁরা কেউই আসেননি।

পিনারাই বিজয়নকে নিয়ে প্রশ্ন ছিল না। এইমুহূর্তে তিনিই একমাত্র বামপন্থী মুখ্যমন্ত্রী। তিনি আমন্ত্রিত হবেন, সেটা খুব স্বাভাবিকই ছিল। কিন্তু নীতীশ কুমারকে আনার এবং তাঁকে দিয়ে শিলান্যাস করানোর সিদ্ধান্তটা কারা নিয়েছিলেন! ভাগ্যিস তিনি আসেননি। নইলে, এই সিদ্ধান্ত কতটা ব্যুমেরাং হয়ে দাঁড়াত, ভেবে দেখেছেন!

বাম নেতৃত্ব বলতেই পারেন, নীতীশ যে এভাবে ডিগবাজি মারবেন, আগে থেকে তাঁরা কীভাবে জানবেন? নীতীশ কোথায় যাবেন, সেটা না হয় জানা ছিল না। কিন্তু নীতীশ এতবছর কোথায় ছিলেন, সেটা মাথায় রাখা হল না? এই নীতীশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রীত্বের বেশিরভাগ সময়টাই তো কেটেছে বিজেপির জোটসঙ্গী হিসেবে। এমনকী, এবারেও তিনি ভোটে লড়েছিলেন বিজেপির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেই। সেই তাঁকে কিনা ঘটা করে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল! কেন, দেশে নাম এত কম পড়িয়াছে?

ভিন রাজ্য থেকে বারবার ‘দলবদলু’দের ভাড়া করে না এনে বিমান বসুকে দিয়ে শিলান্যাস করানো যেত না? নিদেনপক্ষে মানিক সরকারকে দিয়েও করানো যেত। এমনকী সোনিয়া গান্ধী বা মনমোহন সিংকেও ডাকা যেতে পারত। তাই বলে নীতীশ কুমার! যদি সত্যিই তিনি আসতেন, ওই ফলকে জলজল করত তাঁর নামটা।

আর কেউ না বুঝুক, নীতীশ কুমার হয়তো বুঝেছিলেন, তাঁর নৌকো কোন শিবিরে ভিড়তে চলেছে। হয়তো সেই কারণে তিনি নিজেও আসতে চাননি। একদিক দিয়ে বিচক্ষণই বলতে হবে। অন্তত বামেদের বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। অন্তত এই একটা কারণে তাঁকে ধন্যবাদ জানানোই যায়।

# নামেই অরন্ধন, আসলে মহারন্ধন

সরস্বতী মানে কি শুধুই মেয়েদের শাড়ি পরা আর ছেলেদের মেয়ে দেখা? তার বাইরেও আরও অনেককিছু। পরের দিন অরন্ধন। যৌথ পরিবারে সে যেন এক মহারন্ধনের কর্মযজ্ঞ। ফেলে আসা সময়ে উকি দিয়ে টুকরো টুকরো মুহূর্তগুলো ফিরে দেখা। লিখলেন অন্তরা চৌধুরি।

সরস্বতী পুজোর ঠিক পরের দিন। পাড়ার প্যান্ডেল তখনও থেকে যায়। ইতিউতি গান ভেসে আসে। কিন্তু সেদিন অন্য এক 'উৎসব' আমাদের বাড়িতে দেখে আসছি। 'উৎসব' বললাম, কারণ কালীপুজো, দুর্গাপুজোর সঙ্গে এর জৌলুস কোনও অংশে কম নয়। বরং বেশ কিছুটা বেশিই। সরস্বতী পুজোর একটা উত্তেজনা তো থাকতই। তার থেকে বেশি উত্তেজনা ছিল সারাদিন ধরে গোটা বাড়িটা হইহই করত। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত চলত রান্না।

বিশাল বড় উনুনে ঠাকুমা একের পর এক রান্না করত। আলুভাজা, বেগুনভাজা, পালংশাক,

বাঁধাকপি, মাছের ঝোল, মাছের ঝাল, মাছের টক, চাটনি এবং সবশেষে শুদ্ধ কাপড় পরে গোটাসেদ্ধ করা হত। ভাতের হাঁড়ির সাইজ না বলাই ভাল। মা, কাকিমা, জেঠিমারা সারাদিন ধরে রান্নার জোগাড় দিত। ছোটমা তো কুয়োতলাতেই বসে থাকত। আর সারাদিন ধরে শুধু মাছ ধুয়ে যেত। বাবা, কাকা, জেঠুদের মধ্যে রেশারেশি চলত। কে কত মাছ আনতে পারে। চোদ্দ পনের কেজি মাছ তো কোনও ব্যাপারই নয়। তাতেও তাদের মন ভরত না। বাড়িতে সব মিলিয়ে সদস্য সংখ্যা আঠারো থেকে কুড়ি। দু'একজনের আমন্ত্রণও থাকত।

মা, কাকিমাদের ঘাড় পিঠ টানত। বেচারারা সারাদিন খেটেখুটে সবে একটু জিরোতে বসেছে। অমনি রাত দশটার সময় বাবুকাকা আবার চার কেজি মাছ নিয়ে এসে হাজির। যদি কম পড়ে! আমার তিয়াত্তর বছরের ঠাকুমার রাত্রিবেলাতেও সে কি এনার্জি। সে ওই খোঁড়া পায়ে মোড়ায় বসে কাঠের উনুন ধরিয়ে আবার রান্না করতে শুরু করত। বাড়ির বউগুলো রাগে গজগজ করত। ঠাকুমা বলত, 'থাক। তোমাদের কিছু করতে হবে না। আমি রান্না করব।'

রাত্রিবেলায় শিল নোড়া ধুয়ে তাকে নতুন গামছা দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হত। তিনিই নাকি মা ষষ্ঠী। বাঁশ পাতা, দল ঘাস, শামুক সহ সিঁদুর, দই হলুদ আর কাজলের ফোঁটা দেওয়া হত মা ষষ্ঠীকে। ভোগ হিসেবে ভিজে ভাত, গোটা সেদ্ধ, আর যতরকম রান্না হয়েছে সবরকম সাজিয়ে দেওয়া হত। ধূপ, প্রদীপ, শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে পুজো করা হত। এবার বাড়ির সবাইকে সেই দই হলুদের ফোটা দিয়ে দেওয়া হত মা ষষ্ঠীর ভোগ। দেবতাদের মধ্যে এই মা ষষ্ঠী একটু ভিন্ন গোত্রের। কারণ, ফল মিষ্টি এনার খুব একটা পছন্দ নয়।

অরন্ধনের দিন নাকি গরম কিছু খেতে নেই। তাই ঠাকুমা দেখতাম সকাল বেলায় চা, চিনি, জল রোদের মধ্যে রেখে দিত। রোদের আলোয় সেই চা গরম হত। তারপর খেত। এখন অবশ্য যুগ পাল্টেছে। এখন আর কেউ এভাবে চা খায় না। তবে আমাদের বাড়িতে সেই ট্রাডিশন আজও বজায় আছে। কমে গেছে শুধু অস্বাভাবিক রকমের সদস্য সংখ্যা।

পড়াশোনা, বিয়ে এবং চাকরি সূত্রে বাড়ির ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন দেশে বিদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কালের নিয়মে পরিবারের বেশ কিছু সদস্য আজ আর নেই। রয়ে গেছে স্মৃতি হয়ে। অতবড় বাড়িতে এখন জনাকয়েক লোকজন। তারা আজও বাঁচিয়ে রেখেছে সেই ফিকে হয়ে যাওয়া উৎসবের ইতিহাসকে। পনের কুড়ি কেজি মাছ এসে দাঁড়িয়েছে আট দশ কেজিতে।

এই উৎসব বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় মাছের উৎসব। স্থানীয় নাম 'সিজানো'। সারাবছর মাছ খেলেও এই বিশেষ দিনটির জন্য থাকে সকলের অপেক্ষা। আর আমরা কেউ কাজের সূত্রে, কেউ বিবাহসূত্রে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন দ্বীপে নির্বাসিত হয়ে গেছি, এই স্মৃতিচারণ সেই 'আমাদের' উদ্দেশ্যেই।

# সরস্বতী পুজোয় কিন্তু গোপনে সিগারেটেরও হাতেখড়ি

মিলন মুখোপাধ্যায়

ছোটবেলার পুজো বলতে বারবার মনে পড়ে সরস্বতী পুজোর কথা। দুর্গাপুজো নিয়ে বাঙালির আবেগের শেষ নেই। কিন্তু কেন জানি না, সেই আবেগ ছোটবেলায় সেভাবে স্পর্শ করেনি। তার থেকে অনেক বেশি আপন মনে হত সরস্বতী পুজোকে। কারণ, এই পুজোর দায়িত্বে থাকত ছোটরাই। তারাই চাঁদা তুলত, তারাই ঠাকুর আনত, তারাই পুরোহিত ধরে আনত, তারাই বাজার করত, তারাই প্যান্ডেল থেকে প্রসাদ– যাবতীয় আয়োজনের দায়িত্বে থাকত। দুর্গাপুজোয় আমরা ছিলাম অনেকটাই ব্রাত্য। সেখানে নতুন জামাকাপড় পরা, পটকা ফাটানো– এছাড়া আমাদের তেমন কোনও ভূমিকাই থাকত না। সোজা কথায়, আমাদের কেউ পাত্তাই দিত না। এখানে পাড়ার বড়রাই খবরদারি করত। সরস্বতী পুজো এলেই হঠাৎ করে আমরা যেন সাবালক

হয়ে উঠতাম। আমরাও পারি, এটা দেখিয়ে দেওয়ার, বুঝিয়ে দেওয়ার সেরা উৎসব ছিল এই সরস্বতী পুজো।

চাঁদা তুলতে গিয়ে ভুয়ো রসিদ বিলি করা। পুলিশের গাড়ি দেখলেই দৌড় মারা। সেও এক অনাবিল আনন্দ। সরস্বতী পুজোয় ছোটদের হাতেখড়ি হয়। কিন্তু পাড়ার প্যান্ডেলের পেছনে লুকিয়ে সিগারেট খাওয়ার হাতেখড়িও কিন্তু সেই সরস্বতী পুজোতেই। প্যান্ডেলের পেছনে ছিল একটা ছোট্ট গোপন ঘর। সেখানেই কত নিষিদ্ধ কৌতূহলের জন্ম। সেই প্রথম, রাতে বাড়ির বাইরে থাকার ছাড়পত্র। সারা রাত জেগে আড্ডা। সেই আড্ডায় তখনও সুরার প্রবেশ ঘটেনি। সিগারেটে একটা বা দুটো টান দেওয়া, এটাই ছিল বিরাট অ্যাডভেঞ্চার। সেই প্রথম একসঙ্গে রাত জাগা। সারা বছর সকালে স্নান করার কোনও বালাই নেই। কিন্তু এই সরস্বতী পুজো এলেই স্নান সেরে, নতুন পাঞ্জাবি গায়ে সাঁটিয়ে বেরিয়ে পড়া। কিশোরবেলার সেই লাজুক মুখ। শাড়ি পরে কে কে মণ্ডপে এল, আঁড়চোখে একটু জরিপ করে নেওয়া। প্রেমপত্র পকেটে নিয়ে পিছু নেওয়া। কিন্তু এত লোকের মাঝে কি আর দেওয়া যায়! এই সঙ্কোচে কত কাঁচাহাতের প্রেমপত্র পকেটেই থেকে গেল। শেষমেশ আর দেওয়াই হল না।

আচ্ছা, মেয়েরা কি ছেলেদের এই মনোভাবের কথা বুঝতে পারত? এখন বুঝি, আলবাত বুঝত। নইলে, তারাই বা এমন সেজেগুজে শাড়ি পরে আসত কেন? কতজন পিছু নিচ্ছে, তারাও হয়তো মনে মনে হিসেব কষত। অন্য বান্ধবীদের সঙ্গে হয়তো কম্পিটিশনও করত। এখন বুঝি, কিন্তু তখন বুঝতাম না। বুঝলে এমন দুরুদুরু বুকে পিছু নিতাম না। সোশ্যাল মিডিয়ার আবহে প্রেম নিবেদনটা কত সহজ হয়ে গেছে। তবে, মাঝে মাঝে মনে হয়, সেই লাজুক দিনগুলোই ভাল ছিল।

বিনোদন

# একান্ত সাক্ষাৎকারে উর্মিমালা বসু

## আবেগটাই নেই, তাই জুটিও তৈরি হচ্ছে না

শ্রুতিনাটক বলতেই ভেসে ওঠে দুটো নাম— জগন্নাথ বসু, উর্মিমালা বসু। অনেকে বলেন, শ্রুতিনাটকের উত্তম-সুচিত্রা। বাংলায় অনেক জুটির মাঝে আরও একটা স্মরণীয় জুটি। এক অনুষ্ঠানে একসঙ্গে পাওয়া গেল সেই জুটিকে। একান্তে পাওয়া গেল উর্মিমালা বসুকেও। কিছুটা ইন্টারভিউ। কিছুটা আড্ডা। বেঙ্গল টাইমসের জন্য সেই অন্তরঙ্গ কথোপকথন তুলে আনলেন সংহিতা বারুই।

প্রশ্ন: এখন শ্রুতিনাটক বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু যখন শুরু করেছিলেন, তখন তো বেশ ঝুঁকির কাজ ছিল। এমন একটা বিষয়কে বেছে নিলেন কেন?
উর্মিমালা: আশির দশকের গোড়ায় নতুন কিছু করার ভাবনা থেকেই এই শ্রুতিনাটক। আস্তে আস্তে ব্যাপারটা পরিচিতি পেতে থাকে। আবৃত্তি তো ছিলই। পাশাপাশি এই শ্রুতি নাটক দর্শকদের ভালই লাগল।

প্রশ্ন: এত এত শ্রুতিনাটক করেছেন। প্রিয় বাছতে বললে কোনগুলো বাছবেন?
উর্মিমালা: ওরকমভাবে প্রিয় হয় না। হাজার হাজার কবিতা। অসংখ্য শ্রুতিনাটক। যেদিন যেটা ভাল লাগে, সেদিনের জন্য সেটা প্রিয়।

প্রশ্ন: রেডিও না মঞ্চ, কোনটা বেশি উপভোগ করেন?
উর্মিমালা: রেডিওর মাধ্যমে একসঙ্গে অনেক দর্শকের কাছে পৌঁছে যাওয়া যায়। শ্রোতাদের মনযোগও হয়ত বেশি থাকে। তবে কোনটা দর্শকদের কেমন লাগল, তা বুঝতে পারি না। কিন্তু মঞ্চে সঙ্গে সঙ্গেই রেজাল্ট। ভাল হলে দর্শক নেবে। খারাপ হলে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিয়ে দেবে।

প্রশ্ন: জগন্নাথ-উর্মিমালা মানেই আবৃত্তির জনপ্রিয় এক জুটি। অন্য কারও সঙ্গে কাজ করেছেন? সেই অনুভূতি কেমন?
উর্মিমালা: অন্যদের সঙ্গেও করেছি। তবে সেটা মূলত অর্থের তাগিদে। সেগুলো খুব একটা উপভোগ্য হয়নি।

আমাদের জুটিটাকে শ্রোতারা গ্রহণ করেছেন। দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব জরুরি। ভবিষ্যতেও হয়তো অন্যদের সঙ্গে করতে হতে পারে। তবে সেটা নেহাতই প্রয়োজনের তাগিদে। সেই রোমাঞ্চটা থাকবে না।

প্রশ্ন: এত এত কবিতা, শ্রুতিনাটক। মনে রাখেন কী করে?
উর্মিমালা: এতবার করে করতে হয়, এমনিই মুখস্থ হয়ে যায়। তবু রেডিওতে বা মঞ্চে যখন করি, হাতে খাতা রাখতেই হয়। যদি কোথাও ভুলে যাই!

প্রশ্ন: দেশে-বিদেশে এত অনুষ্ঠান করেছেন। প্রিয় অনুষ্ঠান বাছতে বললে কোনটা বাছবেন? কোনও বিশেষ স্মৃতি আছে, যা এত বছর পরেও মনে দাগ কেটে যায়?

উর্মিমালা: অনেক অনুষ্ঠান। অনেক রকম স্মৃতিই রয়েছে। তবে একটি ঘটনা মনে দাগ কেটে যায়। জঙ্গলমহলে অনুষ্ঠান করতে গেছি। তার আগে নানা ভৌতিক গল্প শুনেছি। রাস্তা শুনশান। যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, আদৌ লোকজন শুনতে আসবে তো? গিয়ে দেখলাম, মাঠ ভর্তি লোক। একটি মেয়ে বাড়িতে রান্না করে, মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে আমাদের অনুষ্ঠান দেখতে এসেছিল। আমরা যখন 'তাহার নাম রঞ্জনা' করলাম, মেয়েটি আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। ছেলেবেলায় বাড়িতে রেডিওতে যাদের নাটক শুনে বড় হয়েছে, তারা যে ওর সামনে, সেটা ওকে যেন নাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। এগুলোই তো বড় পাওনা। এখনও সেই মেয়েটার মুখটা মনে পড়ে।

প্রশ্ন: আপনাদের পর আর শ্রুতিনাটকের তেমন জুটি উঠে এল না।
উর্মিমালা: সেটা আমি বলতে পারব না। তোমরা বলতে পারবে। শ্রুতিনাটকও একরকম কায়িক অভিনয়। শরীরের বিভঙ্গগুলো যদি অভিনয়ের মাধ্যমে কণ্ঠে প্রকাশ না করা যায়, দর্শকরা নেবে কেন? বর্তমান প্রজন্মের শিল্পীরা হয়ত সেটা সেভাবে করে উঠতে পারছে না। তাই জুটি উঠে আসছে না। অনুভূতি-আবেগ এগুলো হয়তো হারিয়ে যাচ্ছে। বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগ হয়ত সেভাবে হচ্ছে না। পড়তে হয়, তাই পড়ে শুনিয়ে দিচ্ছে। তাই শ্রুতিনাটক পিছিয়ে পড়ছে।

প্রশ্ন: শ্রুতিনাটক শুনতে গেলে শ্রোতাকেও শিক্ষিত হতে হয়। ধৈর্য থাকতে হয়। এখনকার দর্শক-শ্রোতাদের সেই ধৈর্য কি কমে আসছে?

উর্মিমালা: একেকজনের রুচি তো একেক রকম। কেউ ব্যান্ড শুনতে ভালবাসে, কেউ কবিতা শুনতে ভালবাসে। তবে আমাদের নিজস্ব কিছু শ্রোতা আছে। তারা ঠিক শোনে। তাই কখনও মনে হয় না সবকিছু হারিয়ে গেছে।

প্রশ্ন: আপনারা অনুষ্ঠান করছেন। সামনে বসে কেউ সমানে মোবাইল ঘেঁটে যাচ্ছে। এতে রাগ হয় না?
উর্মিমালা: রাগ হয়। কিন্তু কিছু করার নেই। শিক্ষার অভাব। কোথায় কী করব, এই বোধটা অনেকেরই থাকে না। তবে যাঁরা শ্রুতিনাটকের শ্রোতা, তাঁদের নিয়ে সমস্যা নেই। তাঁরা জানেন, কখন কী করতে হয়। নানা টেকনোলজি আসছে। আমাদেরও পরিবর্তন দরকার। আমি ফেসবুক করি না, হোয়াটসঅ্যাপ করি না, গল্প করি না, গান শুনি না, এগুলোও কিন্তু অশিক্ষার লক্ষ্মণ। সব জিনিসের ভাল-খারাপ দুটো দিকই আছে। কোনটা কীভাবে গ্রহণ করব, সেটা নিজস্ব রুচির ব্যাপার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেটা নিয়ে মেতে থাকা যেমন ঠিক নয়, তেমনি মুখ ফিরিয়ে থাকাও ঠিক নয়।

প্রশ্ন: ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ এগুলোর ফলে নিজের আবৃত্তি বা অনুষ্ঠানের লিঙ্ক শেয়ার করতে পারেন। এসব আসায় কতটা সুবিধা হয়েছে?

উর্মিমালা: একটা অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে অনেক খরচ। ছোট ছোট সংস্থা এত টাকা পাবে কোথায়? তারা যদি ফেসবুকে বিজ্ঞাপন করে, তাদের অনুষ্ঠানের ঘোষণা শ্রোতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করে, ভালই তো। তবে 'একলা অচিন পাখি' 'রাত জাগা পাখি' এই সব লোকের সঙ্গে গল্প করার কোনও ইচ্ছে নেই। এদের সঙ্গে বন্ধুত্বও করি না। যাদের নাম, ছবি দেওয়ার সাহস নেই, তাদের সঙ্গে কীসের বন্ধুত্ব? তবে এই সোশাল মিডিয়াতেই বেশ কিছু হারিয়ে যাওয়া বন্ধুকে খুঁজে পেয়েছি। এগুলো না থাকলে হয়ত তাঁদের আর খুঁজেই পেতাম না। কে যে কোথায় আছে, জানতেও পারতাম না।

# ওপেন ফোরাম

# হ্যাঁ, রাজ্যসভা শমীকবাবুদেরই জায়গা, আকাট মূর্খদের নয়

## অজয় কুমার

সিগারেটের প্যাকেটে একটা বিধিসম্মত সতর্কীকরণ লেখা থাকে। তেমনই শুরুতেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল, আমি মোটেই বিজেপি নই। সদস্যও নই, সমর্থকও নই। কোনও স্তরের নির্বাচনে এই দলকে ভোট দিইনি। আমি মোদিরও সমর্থক নই, রামমন্দিরেরও সমর্থক নই।

কিন্তু তারপরেও বিজেপি-র একটি সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। রাজ্যসভায় তারা মনোনয়ন দিয়ে শমীক ভট্টাচার্যকে। এই রাজ্যের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে মনে করি, শমীক ভট্টাচার্যের মতো মানুষদেরই রাজ্যসভায় যাওয়া উচিত।

বিধানসভার যা আসন বিন্যাস, তাতে তৃণমূল থেকে যাওয়ার কথা চারজনের, বিজেপি থেকে একজনের। তৃণমূলের তালিকা প্রকাশিত হল দুপুরে। বিকেল নাগাদ জানা গেল বিজেপি প্রার্থীর নাম। তৃণমূলের তালিকায় কিছুটা চমক, কিছুটা অঙ্ক। তবে, চারজনের মধ্যে আদি তৃণমূল কেউ নন। রাজনীতির লোক বলতে একজনই, সুস্মিতা দেব। তিনিও কনভার্টেড তৃণমূল। সন্তোষমোহন দেবের কন্যা। কয়েক বছর আগেও ছিলেন কংগ্রেস সাংসদ। হেরে গিয়ে নাম লিখিয়েছিলেন তৃণমূলে। মমতাবালা ঠাকুর। মূল পরিচয়, মতুয়া বাড়ির প্রতিনিধি। রাজনৈতিক জ্ঞান সম্পর্কে যত কম বলা যায়, ততই ভাল। নাদিমুল হক। আগেও দু'বার রাজ্যসভায় ছিলেন। তারপরও তৃণমূল যত, ব্যবসায়ী তার থেকে বেশি। ২০১১-র আগে তৃণমূল নেতা হিসেবে নাদিমুল হকের নাম কেউ শুনেছিলেন! সাগরিকা ঘোষ। ঘোষণার দিন পর্যন্ত তিনি নিজেই জানতেন না, তিনি তৃণমূল। তবে বলতে-কইতে পারেন, অন্তত লেখাপড়াটুকু আছে।

শমীক ভট্টাচার্যকে চিনি দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে। দুরন্ত বক্তা। পড়াশোনা আছে। রসবোধ আছে। তার থেকেও বড় কথা, এতদিনের রাজনৈতিক জীবনে একটিও অসংলগ্ন কথা বলেছেন বলে মনে পড়ছে না। শালীনতার মাত্রা বজায় রেখেও রাজনৈতিক আক্রমণ করা যায়, বাংলার রাজনীতিতে শমীকবাবু অবশ্যই তার বড় একটা উদাহরণ।

কেন জানি না, দলবদলুদের ঠিক মেনে নিতে পারি না। যিনি যে দলের, সেই দলটাই মন দিয়ে করুন, কোনও সমস্যা নেই। 'মানুষের কাজ' করতে এত দল বদল করতে হয় কেন, বুঝি না। যে কারণে, জয়প্রকাশ মজুমদারদের থেকে মদন মিত্রদের বেশি বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। যে কোনও মানুষেরই রাজনৈতিক সততাটা খুব জরুরি। যেমন জরুরি বিষয় হল পড়াশোনা ও মাত্রাজ্ঞান। শমীকবাবু দল বদলাতে পারেন, এমন গুঞ্জন কখনও শুনেছেন? যে তৃণমূল দল ভাঙানোয় এত পটু, তাঁরা কি শমীককে দলে টানার চেষ্টা করেনি? নিশ্চিতভাবেই তাঁর কাছেও প্রস্তাব গিয়েছিল। তাছাড়া, তিনি নিজেও যদি একবার আগ্রহ দেখাতেন, ক্যাবিনেটে জায়গা বাঁধা ছিল। লোকসভা বা রাজ্যসভাতেও যেতেই পারতেন। কিন্তু 'সওদা' করেননি। এখনকার বাজারে এটাও কম কথা নয়।

আচ্ছা, রাজ্যসভা কাদের জন্য? একটা কথা খুব পরিষ্কারভাবেই বলা দরকার, আর যাদের জন্যই হোক, মূর্খদের জন্য নয়। কিন্তু গত এক দশকের বেশি সময় ধরে আমাদের রাজ্য থেকে যাঁরা লোকসভা বা রাজ্যসভায় যাচ্ছেন, তাঁদের লেখাপড়ার হাল দেখলে সত্যিই বড় করুনা হয়। 'লেখাপড়া' মানে শুধু ডিগ্রি নয়, রাজনৈতিক বোধ ও বিচক্ষণতা। হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া অধিকাংশের মধ্যে পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার মতো যোগ্যতাও নেই। এঁদের সাংসদ ভাবতে সত্যিই লজ্জা হয়। যাঁরা এঁদের নির্বাচন করেন, তাঁদের প্রতি আরও রাগ হয়। যাঁকে খুশি লোকসভা-রাজ্যসভায় পাঠিয়ে দেওয়া যায়, এমন ভাবার সাহসটা তাঁরা পেলেন কীভাবে? তখন রাগ হয় রাজ্যের দন্ত বিগলিত করা মিডিয়ার ওপর। মূলস্রোত মিডিয়া নখদন্তহীন বলেই দলগুলি অর্বাচীনদের মনোনয়ন দেওয়ার সাহস পায়।

যেমন, বিজেপির কথাই ধরা যাক। আগেরবার তারা মনোনয় দিল অনন্ত মহারাজকে। কোন দল কাকে মনোনয়ন দেবে, সেটা অবশ্যই তাদের দলীয় বিষয়। কিন্তু বিজেপি-র মধ্যে যোগ্য কাউকে পাওয়া গেল না যাঁকে রাজ্যসভায় পাঠানো যায়! শেষে কিনা অনন্ত মহারাজ! যিনি তার কদিন আগে তৃণমূলের মঞ্চে ছিলেন। যিনি বছরের অধিকাংশ সময় ফেরার থাকেন! যিনি কোন দলের সমর্থক, নিজেই জানেন না। আজ বিজেপি, তো কাল তৃণমূল হতে একদিন সময় লাগবে না। এইসব আয়ারাম-গয়ারামদের যারা নির্বাচন করেন, তাদেরও কেমন যেন দেউলিয়া মনে হয়।

রাজনীতি থেকে লেখাপড়া, সৌজন্যবোধ ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। যাঁরা এখনও সেই চর্চা বজায় রেখেছেন, যাঁরা এখনও বাগ্মীতার জন্যই স্মরণীয়, শমীকবাবু তাঁদের একজন। তাঁর বক্তৃতায় লোকখেপানো নেই, মিথ্যে তথ্যের বেসাতি নেই, নোঙরা আক্রমণ নেই। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে মন থেকে সবসময় একমত হতে পারি না, কিন্তু মন থেকে তাঁর পড়াশোনা ও বাগ্মিতাকে কুর্নিশ করতে দ্বিধা হয়নি। এই লোকটা কাল দল বদলে ফেলতে পারেন, কখনও এমনটা মনে হয়নি।

যাক, দেরিতে হলেও বিজেপি নেতৃত্বের সুমতি ফিরেছে। হ্যাঁ, রাজ্যসভা শমীকবাবুদেরই জায়গা। ওই সকাল-বিকেল পাল্টি খাওয়া অনন্ত মহারাজদের নয়।

# জঙ্গলের মাঝে আস্ত এক বিমানবন্দর!

অভিজিৎ দে

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! পৃথিবী তো ছেড়ে দিন। নিজের রাজ্যকেই বা কতটুকু চিনি! বাঁকুড়া জেলায় এক সময় বিমানবন্দর ছিল। নিয়মিত বিমান নামত। এটাই বা আমরা কজন জানি! সত্যিই, পরতে পরতে কতকিছু অজানা থেকে যায়। জঙ্গল দেখতে ডুয়ার্স যাই। কিন্তু ঘরের কাছের জঙ্গল মহলে যাই না। আবার সেই রবি ঠাকুরকে ধার করেই বলতে ইচ্ছে করে, দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/ ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া।

অনেকদিন ধরেই ইচ্ছে ছিল, একবার জয়পুরের জঙ্গলে যাব। নানা কারণে যাওয়া হয়ে উঠছিল না। হয়ত এত কাছে বলেই গড়িমসি করছিলাম। শেষপর্যন্ত বেরিয়েই পড়লাম। এমনিতে মোটেই খুব দূরে নয়। বাঁকুড়া থেকে ঘণ্টা দেড়েক। ওন্দা, রামসাগর পেরিয়ে, বিষ্ণুপুর ছুঁয়ে সোজা রাস্তা ধরে গেলেই হবে। বিষ্ণুপুর পেরিয়েই পাবেন মস্ত এক জঙ্গল। দিনের বেলায় তেমন আহামরি মনে হবে না। কিন্তু রাতের বেলায় গা ছমছম করতেই পারে। শুনেছি, একসময় এই জঙ্গলে রাস্তায় গাছ বা বোল্ডার ফেলে ডাকাতি হত। আর শ্রীমান

গজরাজের আনাগোনা তো আছেই। মাঝে মাঝেই নাকি রাস্তায় হাতির দল দাঁড়িয়ে থাকে। দু'পাশে গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। আর রাস্তা পেরিয়ে জঙ্গলের এদিক থেকে ওদিক যাওয়া তো হামেশাই ঘটে।

কলকাতা যাওয়ার নাইট সার্ভিস গুলো এই দিক দিয়েই যায়। রাতে এই পথটা নিশ্চিতভাবেই বাড়তি একটা রোমাঞ্চ এনে দেয়। কিন্তু দিনের বাস সেভাবে যায় না। এখন বাঁকুড়া-কলকাতা বেশিরভাগ বাসই যায় দুর্গাপুর হয়ে। ফলে, এই রাস্তাটা কিছুটা দুয়োরানি হয়ে গেছে। সেই কারণেই অনেকের সঙ্গে জয়পুরের যোগাযোগটাও কমে এসেছে। হয়ত তাই, আত্মীয়তায় ভাটা পড়েছে।

শুনেছিলাম, সেখানে বনলতা রিসর্ট নামে একটা দারুণ ঘোরার জায়গা হয়েছে। অনেকেই ঝটিকা সফরে ঘুরতে যায়। অনেকে দল বেঁধে পিকনিকে যায়। সোশ্যাল সাইটে আমার কোনও অ্যাকাউন্ট নেই। তবু এর-তার মোবাইলে ছবি দেখি। বনলতা নিয়ে নানা আলোচনা শুনি। এখন নানা জায়গায় ফার্ম হাউস বা ইকো ট্যুরিস্ট ভিলেজের কথা শুনি। সেদিক থেকে কনসেপ্টটা কিছুটা অভিনব।

রিসর্ট বলতে আমরা ভেবে নিই, শুধু থাকার জায়গা। কিন্তু এটা শুধু থাকার নয়, ঘোরারও জায়গা। সারাদিন এখানেই দিব্যি কেটে যায়। ভেতরে যেন বিশাল এক সাম্রাজ্য। সবকিছু আপনি ভেতরেই পেয়ে যাবেন। একদিকে চাষবাসের বিশাল আয়োজন। ধান তো আছেই। বিশাল জায়গাজুড়ে নানারকম সবজি চাষ। শহর থেকে আসা অনেকে হয়ত জানেই না আলু মাটির তলায় হয় নাকি ওপরে। এখানে এলে পাবেন আলু, ফুল কপি, বাঁধা কপি, বেগুন, কুমড়ো, লাউ, মুলো। রয়েছে নানা ফলের গাছও। আরেক দিকে হাস-মুরগি তো আছেই। সঙ্গে এমু পাখি, টার্কি, তিতির, খরগোশ। কড়কনাথ মুরগির কথা ইদানীং কাগজে মাঝে মাঝেই পড়ি। কিন্তু কখনও দেখার সুযোগ হয়নি। দেখলাম বনলতায় গিয়ে।

লাল মোরামের রাস্তা বিছোনো। অলসভাবে যে কোনও রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান। কোথাও কুঁড়ে ঘর, কোথাও পুকুর, কোথাও সবজি খেত, কোথাও এমু পাখির আস্তানা। ঘুরে ঘুরে সবটা দেখে নিন। যাঁরা গ্রামের মানুষ, তাঁদের কাছে সবজি খেত হয়ত নতুন কিছু নয়। কিন্তু যাঁরা শহর বা আধা শহরে থাকেন, তাঁদের কাছে এগুলো নতুন মনে হবে। বিশেষ করে ছোটরা, মোবাইলেই যাদের শৈশব আর কৈশোর আটকে আছে, তাদের কাছে এই 'সবুজের অভিযান' মন্দ লাগবে না। ঘেরা জায়গায় প্রকৃতিকে এক উঠোনের মধ্যে পাওয়ার হাতছানি। আর খাওয়া-দাওয়া! সেটা নিয়েও কোনও চিন্তা নেই। রয়েছে যাবতীয় আয়োজন। কোনওটাই কেনা নয়। সব এখানে বানানো। যা সবজি, সব এখানেই চাষ হয়। এমনকী, রসগোল্লাও

এখানকার গরুর দুধেই বানানো। বাইরের কাউন্টারে রয়েছে নানা উপহার সামগ্রী। রাতে থাকতে চাইলে, সেই আয়োজনও রয়েছে। কুঁড়ে ঘরের রোমাঞ্চও আছে, আবার চাইলে সেই কুঁড়ে ঘরের ভেতর বাতানুকূল যন্ত্রের ব্যবস্থাও রয়েছে।

মনে হতেই পারে, রিসর্টের ঢাক পেটাচ্ছি। না, ওই রিসর্টের কাউকেই চিনি না। তাদের বাণিজ্যিক প্রচারের কোনও দায় নেই। শুধু একদিন ঘুরে আসার অভিজ্ঞতা, মুগ্ধতা মেলে ধরলাম। ভালটাকে ভাল বলতে বাধা কোথায়! এ তো গেল ঘেরা রিসর্টের কথা। এবার আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে খোলা জঙ্গল। যে কোনও একটা রাস্তা দিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ুন। এমনিতে ভয়ের কিছু নেই। তবে গজরাজের কথা ভেবে একটু সাবধান থাকা ভাল। তাই সঙ্গে গাড়ি বা বাইক থাকলে নিরাপদ। কোন রাস্তাটা কোথায় যাচ্ছে, জানার দরকার নেই। যে কোনও মাটির রাস্তা দিয়ে ঢুকে পড়ুন। দু পাশে শাল, সেগুন, পলাশ, মহুলের ঘন জঙ্গল। মাঝে সরু রাস্তা। অদ্ভুত একটা গা ছমছম করা অনুভূতি। এভাবেই দেখতে পেলাম একটা ক্যানেল। সারা বছর জল থাকে না। কিন্তু বর্ষায় সেটাই যেন একটা নদী হয়ে যায়। ইচ্ছে করে সেই স্রোতে ভেসে যেতে। হঠাৎ কানে এল প্রবল জলের আওয়াজ। দেখলাম, অনেক ওপর থেকে জলপ্রপাতের মতো জল পড়ছে। চমৎকার দৃশ্য। বাঁকুড়ার নায়গ্রা মনে হতেই পারে।

পাশ দিয়ে যাচ্ছে একটা পিচের রাস্তা। শুনলাম, সেই রাস্তা দিয়ে তিন-চার কিলোমিটার গেলেই নাকি এয়ারপোর্ট। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। এই জয়পুরের ঘন জঙ্গলে এয়ারপোর্ট! ইয়ার্কি হচ্ছে! পরে আরও কয়েকজনকে জিজ্ঞেস করলাম। কী আশ্চর্য, তারাও একই কথা বলল। ঠিক শুনছি তো! মনে হল, এতটা যখন এসেছি, তখন আরেকটু যাওয়াই যায়। জঙ্গলের বুক চিরে এগিয়ে চললাম সেই এয়ারপোর্টের খোঁজে। এক বিস্ময় যেন অপেক্ষা করেছিল। জঙ্গলের মাঝে দীর্ঘ পথজুড়ে সিমেন্টের চাতাল। এটাই নাকি রানওয়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জরুরিকালীন প্রয়োজনে বানানো হয়েছিল। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এই চার বছর নাকি এখানে বিমান ওঠা-নামা করত। যদিও যাত্রীবাহী বিমান নয়, সেই বিমানগুলিতে সেনাকর্মীরাই যাতায়াত করতেন। তারপর যুদ্ধ থেমে গেল। স্বাভাবিক নিয়মে সেই বিমানবন্দরও অবলুপ্ত হয়ে গেল। আস্তে আস্তে জঙ্গলে ঢাকাই পড়ে গেল। ভাবলেই অদ্ভুত এক শিহরণ হয়। এই জঙ্গলের মাঝে বিমান নামত! এতবড় একটা সত্যি এতদিন জানতাম না! সত্যিই, বিপুলা এ বাংলার কতটুকু জানি!

## কীভাবে যাবেন?

যাঁরা কলকাতা বা অন্যান্য জেলা থেকে আসবেন, তাঁরা ট্রেনে বিষ্ণুপুর আসতে পারেন। সেখান থেকে গাড়িতে আধ ঘণ্টা। কলকাতা থেকে আরামবাগ হয়ে বাসেও আসতে পারেন।

## কোথায় থাকবেন?

জয়পুরের বনলতা রিসর্টে থাকতে পারেন। ফোন নম্বর ৯৭৩২১১১৭০৬/ ০৩২৪৪ ২৪৯২৩৪ । এছাড়া বিষ্ণুপুরে অনেক হোটেল আছে। সেখান থেকেও ঘুরে আসতে পারেন।

# পাহাড় যেন দু’হাত উজাড় করে সবকিছু ফিরিয়ে দিল

শান্তনু পাঁজা

আজ শোনাব একটু অন্য রকম গল্প। না চাইতেও অনেক কিছু পাওয়ার গল্প। সেটা এপ্রিলের ১১ তারিখ। চাকরিটা ছাড়ব ছাড়ব করে ছেড়েই দিয়েছিলাম ওই দিন। সেদিনই ঠিক করি ৩ মাস নোটিশ পিরিয়ড সার্ভ করার পর পাহাড়ে যাব। হিমালয়ের বর্ষা দেখব কিছুদিন, কোনও এক নির্জন গ্রামে বসে। ফেরার কোনও তাড়া থাকবে না। যেদিন ইচ্ছে হবে, সেদিন বাড়ি ফিরব।

আমার দুই বন্ধুকে ফোন করলাম। চাকরি সূত্রে আলাদা আলাদা জায়গায় থাকলেও একমাত্র ওরাই আছে আমার পাগলামির সাথে সাথ দেওয়ার জন্য। যেমনটা ভেবেছিলাম। ওদেরকে জানাতেই এক কথায় রাজি দুজনেই। দার্জিলিং মেলে জুলাই মাসের টিকিট কেটে নিলাম সঙ্গে সঙ্গে। ১০ তারিখ যাব, শুধু এটুকুই ঠিক ছিল। কোথায় যাব, কদিন থাকব, কিছুই ঠিক করে যাইনি। তাই ফেরার টিকিটটা ইচ্ছে করেই কাটলাম না।

সবাই বলেছিল, বর্ষাকালে পাহাড়ে যাচ্ছিস, তোদের ঘুরতে যাওয়া মাটি হবে। তাছাড়া ওই সময়টা বেশ বিপজ্জনক। জুলাই মাসে ভরা বর্ষাকাল। যখন তখন ধস নামতে পারে। রাস্তায়

আটকেও পড়তে পারি। এইসব নানা উপদেশ, পরামর্শ আসছিল নানা দিক থেকে। কিন্তু আমি তো ভেবেই নিয়েছি, যা হয় দেখা যাবে। এরপর ৩ মাসের নোটিশ পিরিয়ড ধীরে ধীরে গড়াতে লাগল। ভেবেছিলাম, ৩মাসের মধ্যে কলকাতার কোনও না কোনও MNC থেকে তো চাকরির অফার পেয়েই যাব। কারণ এখন আইটি-তে চাহিদা ভালই। কিন্ত মানুষ ভাবে এক, আর হয় এক। ৩ মাসের মধ্যে কলকাতার কোনও কোম্পানি থেকেই ভাল অফার পেলাম না। যেটা পেলাম, সেটা বেঙ্গালুরুতে। যাই হোক, ভাবলাম ছুটি কাটিয়ে ওখানেই জয়েন করব। যদিও মনের মধ্যে শান্তি ছিল না, ভাবছিলাম এতদিনের কলকাতা ছাড়তে হবে, বন্ধুদেরকে আর আগের মতো পাব না, এইসব।

যাই হোক, আসল কথায় আসি। ১০ জুলাই সব কাজ সাঙ্গ করে করে ৩ বন্ধু দার্জিলিং মেলে উঠে পড়লাম। ট্রেন ছুটল নিজের মতোই। আমার মনে শান্তি নেই, রাতে একটুও ঘুম এল না। সকাল সাড়ে আটটায় নামলাম সেই প্রিয় স্টেশন নিউ জলপাইগুড়ি, যেখানে নামলেই মন ভাল হয়ে যায়। কিন্তু এবার পরিস্থিতি অন্যরকম ছিল। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তাটা থেকেই গেছে। কিছুতেই যেন তাড়াতে পারছি না। যাই হোক, দর দাম করে একটা ছোট গাড়ি বুক করে চললাম রামধুরার পথে। রামধুরা হল কালিংপং জেলার ছোট্ট একটা জনপদ, যেখানকার নৈশব্দ নাকি কানে বাজে। আমার চেনা একজন জায়গাটার সন্ধান দিয়েছিলেন। কোন হোম স্টে-তে থাকা যায়, সেটাও বলে দিয়েছিলেন। আর সাত পাঁচ না ভেবে সেখানেই বুকিং করেছিলাম।

এনজেপি থেকে গাড়িতে উঠে শালুগাড়ার জঙ্গল পেরোতেই একটা ফোন পেলাম। 'আমি কি শান্তনুর সঙ্গে কথা বলছি? একটা জব অপর্চুনিটির জন্য কল করছি। আপনি কি আজকে ৪টের সময় ইন্টারভিউ দিতে পারবেন?' আমি সাত পাঁচ না ভেবে বললাম, 'হাঁ পারব।' ফোনটা এসেছিল একটা খুবই বড় কোম্পানি থেকে, তাও আবার কলকাতায়। রাস্তায় পাহাড়ি রেস্তোরাঁয় বসে অসম্ভব সুস্বাদু মোমো আর থুকপা দিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম। পেটের খিদে তো মিটল। কিন্তু অন্য বারের মতো কেন জানিনা সফরটা কিছুইতেই বন্ধুদের সঙ্গে উপভোগ করতে পারছিলাম না। মনের মধ্যে শুধু ঘুরছে, ইন্টারভিউটা দিতে পারব তো! হ্যাঁ তো বলে দিলাম। কিন্তু প্রযুক্তিগত সমস্যা দেখা দেবে না তো? শুনেছি, ওখানে নেটওয়ার্ক খুব একটা ভাল না। যত রামধুরার কাছাকাছি যাচ্ছিলাম ততবার বার ফোনটা দেখছিলাম, নেটওয়ার্ক আছে তো! আছে তো!

অবশেষে যখন হোম স্টের সামনে নামলাম, দেখলাম নেটওয়ার্ক ঠিকঠাক। মন বলছিল, এবার সত্যিই হয়তো কপালে অন্য কিছুই আছে। সত্যিই তাই হল। রুমের সামনে ব্যালকনিতে পা রাখতেই যা দেখলাম, সেটা এই ভরা বর্ষাকালে আমরা কেউ আশা করিনি। দিগন্ত জোড়া পাহাড়, মেঘে ভরা সবুজ উপত্যকা। এক মুহূর্তে সব দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। আমি একটু একটু করে যেন হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছিলাম।

অবশেষে স্নান করে, কুনসং হোম স্টের দিদির হাতের অসম্ভব সুন্দর খাবার খেয়ে চাঙ্গা হলাম। তারপর এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। মানে, বিকেল ৪টে। বন্ধুদেরকে বারান্দায় বসতে বলে, রুম করে বসলাম স্মার্ট ফোন থেকে ইন্টারভিউ দিতে। পুরো ইন্টারভিউটার সময় নেটওয়ার্ক ভালই ছিল, ইন্টারভিউটা হলও খুব ভাল। তারপর একটু মনের বোঝাটা নামতেই, ক্লান্ত শরীরটা বিছানায় ছাড়তেই ঘুমের দেশে।

বড়োজোর ১ ঘন্টা ঘুমিয়েছি। অমনি ফোনটা বেজে উঠেছে। বিরক্ত হয়ে তুললাম। তারপর? ওই যে শুরুতেই বলে-ছিলাম, না চাইতেই অনেক কিছু পাওয়ার গল্প। ফোনের ওপার থেকে এক মহিলা বললেন, 'শান্তনু, you have cleared the technical interview, HR will talk to you for the offer in 30 minutes'। মোদ্দা কথা, আমার একটা ইন্টারভিউ ক্লিয়ার হয়ে গেছে। আরেকটা দিতে হবে। তাড়াহুড়ো করে মুখে চোখে জল দিয়ে আবার বসলাম ইন্টারভিউ দিতে। এবার আর নেটওওয়ার্ক সহায় হল না। অনেকবার কল কেটে গেল, টেকনিক্যাল গোলযোগ হল। অবশেষে, ৩০ মিনিটের ইন্টারভিউ ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে শেষ হল, আর এবারেও আমি গোল দিলাম। এইচ আর সেকশন কনফার্ম করল যে, জব অফারটা আমি পাচ্ছি ২ দিনের মধ্যে। আমার তখন খুশি আর ধরে না। বন্ধুদের সঙ্গে সব খুশি ভাগ করে নিলাম। ওরাও আমার জন্য বেজায় খুশি। রাতে পাহাড়ি দেশি মুরগির ঝোল আর ভাত খেয়ে যেন তিন মাসের ঘুম সারলাম।

সকালে যখন সাড়ে চারটেয় ঘুম ভাঙল, তখন আরেক চমক। জানালা খুলতেই দেখলাম মেঘের আড়ালে সোনায় রাঙা কাঞ্চনজঙ্ঘা স্বমহিমায় বিরাজমান।

আবারও সেই একই, না চাইতেও অনেক কিছু পাওয়া। আমি কোনওদিন আশা করিনি এই বর্ষার মরসুমে ওই মায়াময় রূপ দেখব। আগে বহুবার দেখেছি, অনেক কাছ থেকে দেখেছি, কিন্তু এবারের মতো কখনও না। তারপর আর কি বারান্দায় বসে ঘন্টার পর ঘন্টা তাকিয়েই কাটালাম তিন জনে। এরপর যতগুলো দিন ছিলাম, প্রতি দিন আমার প্রিয় পর্বত দেখা দিয়েছেন, কোনওদিন নিরাশ করেননি।

এত কিছু পাওয়ার পরেও একটা চিন্তা থেকেই গেল। ওই MNC আমাকে দুই দিনের মধ্যে অফার পাঠাবে বলেছিল। কিন্তু ৪দিন পরেও যখন কিছু এল না, তখন খুবই অস্থির লাগছিল। প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য উজাড় করে দিলেও আমি ভাবলাম শেষটা হয়তো ভাল হবে না। অবশেষে ফিরব ঠিক করে তৎকাল টিকিট কাটলাম ৫দিন পর। অনেকখানি ভাল লাগা, মন খারাপ আর দুশ্চিন্তা নিয়ে সমতলে নামলাম। নিউ জলপাইগুড়িতে রাত ৮টার দার্জিলিং মেলে উঠলাম। কিষানগঞ্জ পেরোতে না পেরোতেই ফোনে একটা নোটিফিকেশন এল। তাড়াহুড়ো করে মেলবক্স খুললাম। সত্যিই এই যাত্রায় পাহাড় দু'হাত ভরে সব দিল আমাকে। চিঠিতে লেখা ছিল "congratulations on your offer from....."। যাওয়ার দিনেও উৎকণ্ঠায় ঘুম হয়নি, আজও আর ঘুম হবে বলে মনে হচ্ছে না।

## ভিন্ন স্বাদের ভ্রমণ

শীত বা গ্রীষ্ম, বর্ষা বা বসন্ত, প্রায় সব ঋতুতেই বাঙালির মন উড়ু উড়ু। নদী, পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল— সে কোথাও না কোথাও বেরিয়ে পড়তে চায়। বেরিয়ে পড়েও। সবার ঝুলিতেই বেড়ানোর অনেক গল্প জমে থাকে। ভাল লাগা, মন্দ লাগা— নানা অনুভূতি সে ভাগ করে নিতে চায়। কেউ ম্যাগাজিনে লেখে, কেউ ফেসবুকে লিখেই তৃপ্ত হয়। কেউ অনেককিছু লিখব ভাবে, কিন্তু লেখা আর হয়ে ওঠে না।

আপনার বেড়ানোর সেই ডায়েরি যদি বেঙ্গল টাইমসে উঠে আসে, কেমন হয়! লিখে ফেলুন আপনার অভিজ্ঞতার কথা। 'কীভাবে যাবেন, কোথায় থাকবেন মার্কা' টিপিক্যাল ছকে বাঁধা ভ্রমণ কাহিনী নয়। আপনি লিখুন আপনার মতো করেই। কোনও ফর্মুলা মেনে নয়, যা লিখতে ইচ্ছে করছে, আপনি সেটাই লিখবেন। বেড়ানো মানে পুরো সফরের বর্ণনা নয়। টুকরো টুকরো কত মুহূর্ত, কত মানুষ, যা খুশি লিখতে পারেন। নমুনা দেখতে হলে একবার বেঙ্গল টাইমসের ভ্রমণ বিভাগে উকি মারতে পারেন। এমন নানা লেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

অনেকেই লেখালেখির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। তাই অনেকের মধ্যেই লেখার আগে একটা হীনমন্যতা এসে যায়। সেই হীনমন্যতা ঝেড়ে ফেলুন। আপনি শুধু আপনার অনুভূতির কথা লিখুন। খারাপ হল না ভাল হল, সেই ভাবনা শিকেয় তুলে রাখুন। কোথাও কিছু অসঙ্গতি থাকলে সম্পাদনার পর তা দেখবেন ঠিক হয়ে গেছে। আপনার লেখা সাজিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব আমাদের।

সাহস করে লিখুন। পাঠিয়ে দিন বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়। আর হ্যাঁ, সঙ্গে ছবি থাকলে, তাও পাঠিয়ে দিন। যদি ছবি না থাকে! চিন্তার কিছু নেই। সবজান্তা গুগল তো আছেই।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

# স্নিগ্ধ গ্রাম কোলাখাম

মেঘের চিঠি বয়ে বেড়ানো এক খাম। শান্ত, সুন্দর, স্নিগ্ধ গ্রাম— কোলাখাম। হুল্লোড় নেই, আছে অনাবিল শান্তি। এমন নিরালায় অলসভাবে কাটিয়ে দেওয়া যায় কত মুহূর্ত। ফিরে এসে লিখলেন **সুব্রত মণ্ডল**।

স্কুলের পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়ায় তড়িঘড়ি কোলাখাম যাব ঠিক করলাম। জায়গাটার কথা আগেও শুনেছি। কয়েকটা ভিডিও দেখে কিছু প্রাথমিক ধারণাও হয়েছে। আসলে, আমার কাছে পাহাড় মানেই দার্জিলিং নয়। এইসব পাহাড়ি গ্রাম আমাকে আরও বেশি করে টানে।

রাতের ট্রেনে টিকিট পাওয়া বেশ ঝামেলার। নতুন ট্রেন বন্দে ভারত জিন্দাবাদ। রিজার্ভেশন পেতেও সমস্যা হল না। জোগাড় করলাম হিমালয়ান ওডিসির বুকিং। কথা হল কো-ওনার অনিরুদ্ধ সুরের সঙ্গে। সেইমতো কেয়ারটেকার কুমার রাই আমাদের জন্য কাঞ্চনজঙ্ঘা ভিউ একটা রুমের ব্যবস্থা করলেন। চার দিনের পিকআপ, ড্রপ ও সাইট সিয়িংয়ের জন্য একটা গাড়ি প্যাকেজে করে নিলাম। বিরু তামাং কোলাখামেরই ছেলে। চার দিনের প্যাকেজ ও ১৩ হাজার টাকায় করে দেবে ঠিক হল। বন্দে ভারত দেড়টা নাগাদ এনজিপি পৌঁছাল।

বিরু তামাং স্টেশনেই অপেক্ষা করছিল। ট্রেনের মধ্যেই লাঞ্চ হয়ে গেছিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি চেপে বসলাম। গাড়ি তিস্তা ব্যারেজ, গজলডোবা, ডামডিং এমবিওক হয়ে লাভার রাস্তা ধরল। রাস্তায় ডুয়ার্সের জঙ্গল আর বেশ কিছু চা-বাগান চোখে পড়ল। একটু রোদ, একটু মেঘলা, একটা অদ্ভুত ভাল লাগার আবেশ যেন আমাদের ছুঁয়ে যাচ্ছে। এই পাহাড়, জঙ্গলের

সান্নিধ্য সত্যিই মানুষকে অনেক বেশি উদার করে তোলে। কোনও রাগ নেই, বিরক্তি নেই, হতাশা নেই, শুধুই একরাশ ভাল লাগা। লাভা পৌঁছানোর ঠিক আগে নেওড়াভ্যালির ভিতরে চেকপোস্ট ক্রস করে আমরা জঙ্গলের রাস্তা ধরলাম। এখান থেকে কোলাখাম সাত কিলোমিটার রাস্তা। জায়গায় জায়গায় একটু ভাঙাচোরা। কিন্তু আশপাশের রোমাঞ্চ এতটাই যে সেই ভাঙাচোরা রাস্তায় এতটুকুও বিরক্তি এল না।

সন্ধ্যে নামার ঠিক আগে পৌঁছে গেলাম কোলাখাম গ্রামে। এদিক ওদিক ছড়িয়ে আছে বিভিন্ন হোমস্টে। তার মধ্যে ক্যাসিরো ইন, দ্য নেস্ট, স্টার হলিডেজ, দ্য ট্রেল্‌স এই হোমস্টে গুলো উল্লেখ-যোগ্য। হোমস্টে হিমালয়ান ওডেসির ব্যালকনি থেকে সামনের উপত্যকা চমৎকার দেখা যায়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকলে সামনের কাঞ্চনজঙ্ঘা কাল দেখা যাবে। এখানে বসে থাকলে মনে হয়, অলসভাবে সময় বয়ে যাক। মনে হয়, আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই, কিচ্ছু করার নেই। হোমস্টের ঘরোয়া খাবার আমাদের সত্যিই তৃপ্ত করেছিল। এই যেমন হাতে গড়া রুটি, চিকেন, সবজি, ডাল আলু-পরোটা, চা। বৃষ্টি হলেই আবার এখানে কারেন্ট চলে যায়। হোমস্টের কোনও রুমে টিভি নেই। একদিক থেকে ভালই হয়েছে। নাই বা দেখলাম টিভি। টানা ব্রেকিং নিউজ থেকে অন্তত কয়েকদিনের বিরতি। মেঘ রোদ্দুরের সঙ্গে গল্প করতে করতে কয়েকটা দিন কেটে যাবে। আর লিখব ডায়েরি। সঙ্গী আছে কিছু বই। রাতের খাবার খেয়ে একটু বাইরে এসে দাঁড়ালাম। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, তার মাঝে ব্যালকনি জুড়ে বিভিন্ন ফুল আর অর্কিডের বাহার অসাধারণ লাগছিল।

পরের দিন আকাশ ভালই ছিল। খুব ভোরে উঠে পড়লাম কিছু ছবি তুলব, আর গ্রাম ছেড়ে পাইন গাছের জঙ্গলের দিকে রাস্তা ধরে কিছুটা দূর হেঁটে আসব বলে। কিছুটা দূরে যেতেই গ্রামের চতুষ্পদেরা আমাদের সঙ্গী হল। যতদূর হেঁটে গেছি ওরা আমাদের সঙ্গ ছাড়েনি। আবার যখন ফিরছি তখনও ওরা সঙ্গেই ছিল। ফিরে এসে বেলার দিকে বেড়িয়ে এলাম লাভা, নোকদাঁড়া,

রিশপ আর টিফিনদাঁড়া ভিউ পয়েন্ট। মূল রাস্তা থেকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রায় কিলো মিটার খানেক পথ একটা ছোটখাটো ট্রেক হয়ে। আমাদের সঙ্গে ছোট ছেলে ও মেয়েও বেশ উপভোগ করতে লাগল।

রাতে বৃষ্টি নামল। সকালে কিছুটা পরিষ্কার। পৌঁছে গেলাম ছাঙ্গে ফলস। সেখান থেকে উপরে উঠে এসে নেওড়া ভ্যালির ভিতর দিয়ে রাচেলা টপ গেলাম। রাস্তাটা বেশ এবড়ো খেবড়ো। লাভা বাজারের বিজয়কুমার তার বোলেরো গাড়িতে করে আমাদের রাচেলা টপে নিয়ে গেল। উপরে উঠে সম্মোহিতের মতো অনেকক্ষণ কাটালাম। শুধু মেঘ আর কুয়াশা। দূরে পর্বতের দর্শন তাই হল না। লাভা ফিরে এলাম। পথের ধারে লাভা বাজারের মুখে লামু ফুড সেন্টারে গরম গরম ওয়াই ওয়াই, চিকেন মোমো আর নুডলস খেলাম। তারপর গেলাম মনাস্ট্রি। চারটের সময় প্রার্থনা শুরু হল। এই প্রথম মোনাস্ট্রির ভিতর ছোট–বড় নানান বয়সী লামাদের সঙ্গে পুরো প্রার্থনা পর্ব উপভোগ করলাম।

রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাশের রুম থেকে কর্ণবিদারক আওয়াজ ভেসে আসছে... ও সাকিরে, সাকিরে সাকি.... বুঝলাম কালরাত্রে যে চারজন মেয়ে এই হোমস্টেতে এসে উঠেছে, তারাই আনন্দ ফুর্তি করছে। রাত্রির নিস্তব্ধতা নির্জনতাকে খানখান করে দিচ্ছিল শহুরে এই মেজাজ। কিছুটা রাগই হচ্ছিল। এরা কেন এই শান্ত গ্রামে আসে। এটা যে হুল্লোড় করার জায়গা নয়, এটুকুও বোঝে না! কাল রাত্রে আরও একজন বয়স্ক কাপল এই হোমস্টেতে এসেছেন। তাঁদের কথা ভেবেও খারাপ লাগছিল। কোলাখাম বিখ্যাত অসংখ্য পাখির গুঞ্জনের জন্য। বোধহয় তারাও এই রাত্রে ঘুমোতে না পেরে বিরক্ত।

ভ্রমণ শেষে পরের দিন পাহাড়জুড়ে মুষলধারে বৃষ্টি নামল। সেরা সঞ্চয় হয়ে থাকবে হোম-স্টের সামনে কুমার রাই ও তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের ছবিখানা। অনেক অভিজ্ঞতা আর ভাল লাগার আবেশ নিয়ে ফেরার রাস্তা ধরলাম।

ওপেন ফোরাম

# একটা পাতাও ওরা পড়তে পারছে না

অভিজিৎ পাল

ফেসবুক আর হোয়াটসঅ্যাপকে ঘিরে রোজই কোনও না কোনও অঘটন লেগেই আছে। কখনও ফেসবুক লাইভে আত্মহত্যা। কখনও সেলফি তুলতে গিয়ে দুর্ঘটনা। নতুন নতুন প্রযুক্তি। দিয়েছে অনেককিছু। কিন্তু কেড়ে নিয়েছে বোধ হয় তার থেকেও বেশি কিছু।

আমার সন্তান সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। পড়ে তো লিখলাম, কতখানি পড়ে, জানি না। কারণ, এখন তাকে আর বই হাতে দেখি না। সারাক্ষণ মোবাইল হাতে কী সব যেন করে চলেছে। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। সারাক্ষণ খুটখাট করতেই থাকে। কী করে, জানি না। তবে এটুকু

বুঝি, যা করছে, তার সঙ্গে ওর পড়াশোনার কোনও সম্পর্ক নেই। লকডাউনের পর এটা যেন আরও বেশি করে মান্যতা পেয়ে গেছে। সবাই নাকি অনলাইন পড়াশোনায় ব্যস্ত। বইয়ে নাকি কিছুই থাকে না। সবকিছুই নাকি ওই মোবাইলে আছে। শিক্ষকরা নাকি অনলাইনেই থাকেন। নানা ব্যাপারে পড়ুয়ারা নাকি শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করেন। অনেক বাবা-মা এসব বিশ্বাস করেন। অন্যদের কাছে রীতিমতো বড়াই করে বলেন, তাঁর ছেলে বা মেয়ে অনলাইন ক্লাস করছে। কিন্তু একবার ভেবেও দেখেন না এই প্রজন্মের বড় একটা অংশ কীভাবে বাবা-মার মাথায় টুপি পরাচ্ছে। ওরা কি আমাদেরকে একেবারেই গাধা ভাবে!

মানছি, বয়সটাই খারাপ। এই বয়সেই অনেকে বখে যায়। পরে এই সময়টা আর ফিরে পাওয়া যায় না। ছেলেকে বারবার বুঝিয়েছি। কোনও ফল হয়নি। উল্টে রেগে যায়। দিন দিন প্রচণ্ড অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, ওর পড়ায় মন নেই। বাথরুমেও যায় ফোন

নিয়ে। খেতে বসে খাওয়ার দিকেও মন থাকে না। এতটাই অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছে, এক মুহূর্তও ফোন ছাড়া থাকতে পারছে না। আমার মতো অনেকের ঘরেই হয়ত এই সমস্যা। যার প্রতিকার কী, জানি না।

বাংলাদেশের একটা খবর পড়ে কিছুটা আশা জেগেছিল। সেখানে নাকি রাত দশটার পর ফেসবুক নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। আপাতভাবে এটা গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ মনে হতে পারে। কিন্তু নিজের ছেলের দিকে তাকিয়ে আমার অন্তত মনে হয়, আমাদের দেশেও এই দাবি ওঠা উচিত। ছোট্ট একটা দেশ। নিজের মাতৃভাষাকে ভালবেসে প্রাণ দিয়েছে। মাতৃভাষাকে ভালবাসে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা আমাদের পথ দেখায়।

আমাদের দেশেও তো সেই এক সমস্যা। পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। অহেতুক রাত জাগছে। নিষিদ্ধ সম্পর্কে আসক্তি আসছে। কর্মসংস্কৃতি নষ্ট হচ্ছে। যাঁরা দেশ চালান, তাঁরা কি বুঝতে পারছেন না? তাই, আমাদের দেশেও এই নিয়ম চালু হোক। রাত বারোটা নয়, রাত দশটা থেকে ফেসবুকের উৎপাত বন্ধ হোক।

জানি, অনেকের আপত্তি থাকবে। তাদের হয়ত কিছুটা অসুবিধাও হবে। কিন্তু বিরাট অংশের ছাত্র-যুবকে বাঁচানোর এছাড়া আর কোনও উপায় নেই। চোখের সামনে আস্ত একটা প্রজন্ম কেমন তলিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু দেখেও, সবকিছু জেনেও আমরা কেমন উদাসীন হয়ে আছি।

# সুখস্মৃতি উঠে আসুক

ফেলে আসা দিন মানেই একটা নস্টালজিয়া। টুকরো টুকরো কত স্মৃতির ভিড়। জীবনে যত ব্যস্ততাই আসুক, সেই স্মৃতিগুলো হারিয়ে যাওয়ার নয়। ফিরে ফিরে ঠিক এসে যায়। আর একটু অবসর পেলে তো কথাই নেই। কারও মনজুড়ে আছে স্কুলজীবনের স্মৃতি। স্কুল পালিয়ে খেলতে যাওয়া বা দুপুরে আম পাড়তে যাওয়া। স্কুলে পড়তে পড়তেই কারও জীবনে এসে যায় প্রথম প্রেম, কারও আবার প্রেমের সঙ্গে এসে যায় যন্ত্রণা। সবকিছুই একে একে মনে পড়ে যায়। সে প্রেমও বড় সত্যি, সে যন্ত্রণাও বড় পবিত্র। স্কুল পেরিয়ে কলেজ জীবন। সেখানেও কত স্মৃতির কোলাজ। কলেজ রাজনীতি থেকে দল বেঁধে হারিয়ে যাওয়া। হইহুল্লোড় থেকে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই। এক জীবনে কত ভিন্ন স্রোত।

এসবকিছু নিয়েই স্মৃতিটুকু থাক। এটা কোনও সেলিব্রিটিদের কলাম নয়। একেবারে আম আদমির কথা। প্রায় দু' বছর ধরে চলছে বিভাগটি। এর মধ্যেই বেশ জনপ্রিয়। শুরুতে চিঠি পাঠাতে হয়ত কিছুটা দ্বিধা থাকত। এখন কিন্তু অনেক চিঠি আসছে। অনেকেই নিজের নানা অভিজ্ঞতার কথা মেলে ধরছেন। সবার জীবনেই তো টুকরো টুকরো নানা অভিজ্ঞতার সমারোহ। সেগুলো যদি অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া যায়, মন্দ কী?

জীবনে চলার পথে হারিয়ে যাওয়া কোনও বন্ধুর সেই দুষ্টুমির কথা উঠে আসতেই

পারে। কোনও মাস্টারমশাইয়ের ধমক বা স্নেহের শাসন, সরস্বতী পুজো বা দুর্গা পুজোর ছোট ছোট ঘটনা, যেগুলো মাঝে মাঝেই মনে পড়ে যায়। লড়াইয়ের দিনগুলোয় কারা বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সাহায্যের হাত? জীবনের এতটা পথ পেরিয়ে আসার পর যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে ইচ্ছে করে, সেই দরজা খোলা থাক। ছোটবেলার বা কলেজ জীবনের কোনও একটা ভুল, যা আজও তাড়া করে বেড়ায়, মনে হয় ক্ষমা চাইতে পারলে হয়ত কিছুটা হালকা লাগত। অকপটে সেসব কথাও বলা যায়। তারপর দরকার হলে সেই লেখার লিঙ্ক পাঠিয়ে দিন সেই মানুষটির কাছে। সহজ কথা, কোনও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ নয়, কোনও তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নয়, একেবারে মনের কথা, সহজ ভাষায়। যেন 'নদী আপন বেগে পাগল পারা'। নিজের ভাবনার ডালপালা মেলে ধরুন।

লেখার অভ্যেস নেই? ঠিক গুছিয়ে লিখতে পারছেন না? এ নিয়ে হীনমন্যতায় ভোগার কোনও কারণ নেই। আপনি আপনার মতো করেই লিখে পাঠান। যদি কোথাও কোনও অসঙ্গতি বা অসংলগ্নতা থেকেও থাকে, আমরা ঠিক সাজিয়ে নেব। তাহলে আর দেরি কেন? তবে একটা কথা মাথায় রাখা ভাল, কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ বা কুৎসা না করাই ভাল। ব্যক্তিগত আক্রমণ থেকে দূরে থাকুন। খারাপ স্মৃতি তো সবারই থাকে। সেই কাদা ঘেঁটে, অন্যকে দোষারোপ করে লাভ কী? আপনার নিজের মধ্যে পুষে রাখা জড়তার প্রাচীর ভেঙে ফেলুন। আপনার সযত্নে লুকিয়ে রাখা স্মৃতি ভাগ করে নিন অন্যদের সঙ্গেও। না হয় ভাল স্মৃতিগুলোকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলাম। বেঙ্গল টাইমসের পাতায় সেই সুখস্মৃতি ভিড় করুক।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা:

bengaltimes.in@gmail.com

# কোয়েস–ইমামি বুঝি সর্বহারা!

ময়ূখ নস্কর

দাদা, আপনি কি বাঙাল?
তাহলে একদিন আমার বাড়িতে আসুন। ঘটি বাঙাল নিয়ে তর্ক করতে আমার দারুণ লাগে। আরে শুধু তর্ক নয়, জয়নগরের মোয়া খাওয়াবো। এমন মোয়া পশ্চিমবঙ্গেই হয়। কী বললেন, ঘটিরা রান্না করতে পারে না? বেশ তো, আপনার রান্না আপনি নিয়ে আসবেন। খেতে খেতে তর্ক করব।

দাদা, আপনি কি বাঙাল+ইস্টবেঙ্গল?
আপনি মশাই আমার দুশমন, কিন্তু তাও আমার বাড়িতে আসুন। মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গল নিয়ে তর্ক করতে আমার দারুণ লাগে। আরে বাগবাজারের রসগোল্লা খাওয়াব। আচ্ছা, বেশ আপনার আনা মিষ্টিও খাব। খেতে খেতে তর্ক হবে। আপনি আমাকে মাচা বলবেন, আমি আপনাকে লোটা বলব। দারুণ জমবে।

দাদা, আপনি কি বাঙাল+ইস্টবেঙ্গল+বামপন্থী?
আরে কমরেড বুকে আসুন। মায়ের হাতে রান্না করা গলদা চিংড়ি খাওয়াবো আপনাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার মায়ের রান্না করা ইলিশ মাছও খাব।

দাদা, আপনি কি বাঙাল+ ইস্টবেঙ্গল + বামপন্থী + হ্যাজ নামানো পাবলিক? সেই সব হ্যাজে

ইস্টবেঙ্গল জিতলে স্তালিনগ্রাদ, ভিয়েতনাম, সর্বহারার জয় ইত্যাদি গা গরম ডায়লগ থাকে? তাহলে দাদা আপনি আমার ত্রিসীমানায় আসবেন না। কারণ, আপনি অতীব জালি ও ঢ্যা_মনা মাল।

আপনি বাঙাল হতে পারেন, ইস্টবেঙ্গল হতে পারেন, কিন্তু বামপন্থী আপনি নন। আপনার ক্লাবও সর্বহারার ক্লাব নয়। আপনাদের ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের কেউই সর্বহারা ছিল না। আপনাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা মন্মথ রায়চৌধুরী, প্রথম সভাপতি ছিলেন সারদারঞ্জন রায়, আপনাদের হ্যাজের ভাষায় তাঁরা সবাই অভিজাত, জমিদার, শ্রেণীশত্রু। আপনাদের স্বর্ণযুগের কর্তা অজয় শ্রীমানিও প্রলেতারিয়েত ছিলেন না। এই ক্লাব কীভাবে সর্বহারার দল হতে পারে? এই ক্লাবের সমর্থকরা কীভাবে মোহনবাগানকে জমিদারদের দল বলতে পারে? হ্যাঁ বলতে পারে, কারণ আপনাদের মতো, অর্থাৎ ইস্টবেঙ্গল + হ্যাজ নামানো বামপন্থীদের মতো ধান্দাবাজ, দু'নম্বরী মার্কেটে দ্বিতীয়টি নেই। মালিয়া, কোয়েস, বাঙ্গুর, ইমামির অর্থে পুষ্ট হয়ে আপনারা পুঁজিবাদ উচ্ছেদের স্বপ্ন দেখেন। নবান্নের দুয়ারে হত্যে দিয়ে আপনারা বামপন্থার বড়াই করেন। আপনারা যদি বামপন্থী হন, তাহলে হিটলারও বামপন্থী। কারণ, সেই খ_চ্চরের পার্টির নামেও 'সোশ্যালিস্ট' শব্দটি ছিল।

যদি আপনারা সাচ্চা বামপন্থী হতেন, তাহলে আপনার প্রিয় দলকে নবান্নে হত্যে দিতে দেখলে লজ্জাবোধ করতেন। আপনাদের প্রিয় দল ট্রফি জিতে কালীঘাটের হাজিরা খাতায় সই করতে যাচ্ছে এই দৃশ্য দেখলে একদলা থুথু ফেলতেন।

আর যদি বাস্তববোধ থাকত, তাহলে স্বীকার করতেন সর্বহারা কখনও ক্লাব বানাতে পারে না। পুঁজি ছাড়া ক্লাব চলে না। কাজেই মোহনবাগান জমিদারদের ক্লাব আর ইস্টবেঙ্গল সর্বহারাদের ক্লাব এটা স্বপ্নদোষ ছাড়া আর কিছু নয়। আপনাদের সেই স্বপ্নদোষ আছে বলেই আপনাদের বামপন্থার সঙ্গে খগেন মুর্মুর বামপন্থা, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বামপন্থার তফাৎ নেই। আপনারা যখন যে কথা বললে বেশি লাইক

পাওয়া যায়, তখন সেই কথা বলেন। যখন যেখানে ভিড়লে বেশি ফায়দা লোটা যায়, তখন সেখানে ভেড়েন।

আরও জেনে রাখুন, ফুটবল খেটে খাওয়া মানুষের সমর্থনের জোরেই বেঁচে থাকে। সব দেশে সব ক্লাবে। সেই খেটে খাওয়া মানুষকে অপমান যদি কেউ করে থাকে সেটা আপনারা। কোয়েসকে স্পন্সর হিসেবে পেয়ে আপনারা ভিখারি মাচা ব্যানার লিখে মিছিল করেছিলেন। তখন আপনার মনে হয়নি এটা সর্বহারার অপমান? নাকি তখন আপনার বামপন্থী বিবেক চক্ষু বুঝে হস্ত_মৈথুন করছিল।

বিপক্ষ দলের গরিব সমর্থকদের এক টাকার কয়েন ছুড়ে, সেই টাকার ছবি ফেসবুকে লটকেছিলেন। তখন আপনার মনে হয়নি এটা বামপন্থার অপমান? নাকি তখন আপনার বামপন্থী বিবেক উদাত্ত কণ্ঠে টুম্পা সোনাকে নিয়ে ব্রিগেড যাওয়ার গান গাইছিল?

তারপর সেই ভিখারির দল যখন আপনাদের মুখে ঝামা ঘষে দিয়ে আই লিগ জিতল তখন আপনার মনে হয়নি এটা সর্বহারার জয়? নাকি তখন আপনার বামপন্থী বিবেক গ্যালারি থেকে "চা চিনি দুধে" টিফো ঝোলাচ্ছিল।
আপনি ভেবেছিলেন সুন্দরবনের জেলে, হাওড়ার বন্ধ কারখানার শ্রমিক, বর্ধমানের খেতমজুর, হুগলির হকার সবাই ভিখারি আর আপনারা বাঙলা বিহার উড়িষ্যার নবাব।
তারপর মাচারা টাকার সন্ধান পেতেই ভিখারিরা হয়ে গেল জমিদার আর চটিচাটা নীতু হলো সর্বহারা। তখন আপনার বামপন্থী বিবেক জেগে উঠে হ্যাজ লিখতে শুরু করল। জ্যোতি বসু যে দলের সমর্থক, কমল বসু যে দলের সমর্থক সেই দল হল জমিদারের দল আর মমতা ব্যানার্জি যে দলকে স্পন্সর এনে দেয়, সেই দল হল বামপন্থী। আপনাদের ডিগবাজি দেখে মুকুল রায় লজ্জা পায়।

শুনুন দাদা, দুটি দলই তৈরি করেছে অভিজাতরা, দুটি দলের পিছনেই টাকা ঢেলেছে পুঁজিপতিরা, দুটি দলকেই সমর্থন করেছে খেটে খাওয়া মানুষ। এখানে স্তালিনগ্রাদ, ভিয়েতনাম, সর্বহারা কোথা থেকে আসে হে? এটা যদি সর্বহারার জয় হয়, আপনারা যদি বামপন্থী হন তাহলে নচিকেতাও বামপন্থী। সেও মমতার মধ্যে লেনিনকে দেখতে পায়। আব্দুর রাজ্জাক মোল্লাও বামপন্থী। সেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে কাঁচা চুলের মদ্দ ছেলে দেখতে পায়।

সাফ কথা শুনুন, আপনি যদি বাঙাল হন, ইস্টবেঙ্গলও যদি হন, আপনি আমার ভাই। যদি বামপন্থী হন আপনি আমার কমরেড। কিন্তু খেলা নিয়ে সর্বহারার হ্যাজ নামাতে এলে বামপন্থা, কমরেড সব ভুলে আপনাকে নিজের হাতে খাওয়াবো...
জুতোর বাড়ি। যেমন তেমন জুতো নয়, হাওয়াই চটি।
হাওয়াই চটি খেতে তো আপনাদের আজকাল ভালই লাগে।

# সেদিন রক্ত দিতে এগিয়ে এসেছিলেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল

## ধীমান সাহা

ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন ভারত অধিনায়ক। রক্ত দিতে সবার আগে এগিয়ে এলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক। ভারতের সেই অধিনায়কের নাম নরি কন্ট্রাক্টর। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজের অধিনায়ক ছিলেন ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। এভাবেই ক্রিকেটের লোকগাথায় অমর হয়ে আছে এই দুটি নাম।

ফ্র্যাঙ্ক ওরেলের জন্মদিন ১ আগস্ট। মৃত্যুদিন ১৩ মার্চ। অর্থাৎ, ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্মদিনও নয়, মৃত্যুদিনও নয়। তাহলে এই দিনটা কেন পালিত হয় ফ্র্যাঙ্ক ওরেল দিবস হিসেবে? আসলে, এই দিনটা সিএবি-র প্রতিষ্ঠা দিবস। ১৯৮১-তে ঘটা করে পালিত হয় সুবর্ণজয়ন্তী। তখন থেকেই ঠিক হয়, এই দিনটা পালিত হবে ফ্র্যাঙ্ক ওরেল দিবস হিসেবে। এই দিনে হবে রক্তদান।

সময়টা ১৯৬২। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েছিল ভারতীয় দল। প্রথম দুটি টেস্টে ফল ভাল হয়নি। তৃতীয় টেস্টের আগে কেনসিংটন ওভালে বার্বাডোজের বিরুদ্ধে ছিল একটি প্রস্তুতি ম্যাচ। সেবার চার্লি গ্রিফিথ যেন বল হাতে আগুন

ঝরাচ্ছেন। ব্যাটসম্যানদের হেলমেট পরার প্রথা তখনও চালু হয়নি। গ্রিফিথের বলে মুহূর্তের জন্য চোখ সরে গিয়েছিল কন্ট্রাক্টরের। চোট লাগে মাথার খুলিতে। ৬ দিন জ্ঞান ছিল না ভারত অধিনায়কের। মাথায় গুরুতর অস্ত্রোপচার করতে হয়েছিল। এমনই গুরুতর আঘাত, কন্ট্রাক্টর আদৌ বাঁচবেন কিনা, তা নিয়েই সংশয়। ত্রিনিদাদ থেকে আনা হল বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। অস্ত্রোপচারের সময় প্রচুর রক্তের প্রয়োজন। সবার আগে রক্ত

দিতে এগিয়ে এলেন ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক ওরেল। দিলেন তাঁর সতীর্থরাও। ভারতীয়দের মধ্যেও রক্ত দিলেন চাঁদু বোরদে, পলি উমরিগড়, বাপু নাদকার্নি। ছ'দিনের মরণপণ লড়াইয়ের পর প্রাণসংশয় কাটল। কিন্তু ক্রিকেট-জীবনে ইতি পড়ে গেল কন্ট্রাক্টরের। এখন তাঁর বয়স ৮৯।

কিন্তু অকালেই বিদায় নিতে হয়েছিল ওরেলকে। মাত্র ৪২ বছর বয়সে ব্লাড ক্যান্সারে মৃত্যু হয়েছিল এই ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তির। মৃত্যুর প্রায় ছয় দশক পরেও এখনও জীবন্ত স্যর ফ্র্যাঙ্ক ওরেল। চার দশকের বেশি সময় ধরে তাঁর স্মৃতিতে এই কলকাতায় হয়ে আসছে রক্তদান শিবির। শুরু হয়েছিল ১৯৮১-তে। প্রথম বার রক্ত দিয়েছিলেন স্বয়ং কন্ট্রাক্টর ও তাঁর স্ত্রী ডলি। রক্তের অঙ্গীকার নিয়ে ৬২ বছর আগে এগিয়ে এসেছিলেন ওরেল। সেই রক্ত আর হৃদয়ের বাঁধনে কিংবদন্তিকে বেঁধেছে কল্লোলিনী তিলোত্তমা।

# সহজপাঠ

নতুন বছরে বাঙালির নতুন পার্বণ— বইমেলা। দেখতে দেখতে সেই বইমেলা শেষও হয়ে গেল। স্বভাবতই বইপত্র নিয়ে আলোচনা চলবে। অনেকেই নতুন নতুন বই কিনলেন। একে একে পড়াও শুরু হয়ে গেছে। কোন বইটা কেমন লাগল? কী বিষয়বস্তু, চাইলে পাঠকদের সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে পারেন।

চাইলে বেঙ্গল টাইমসের মাধ্যমে সেই লেখককে খোলা চিঠিও লিখতে পারেন। আপনি লিখে পাঠান আপনার অভিজ্ঞতা। সংশ্লিষ্ঠ লেখকের কাছে সেই লেখার লিঙ্ক আমরা পৌঁছে দেব। তবে প্রথাগত বুক রিভিউ নয়। আপনি লিখুন একেবারেই আপনার নিজস্ব অনুভূতির কথা। অকারণ প্রশস্তি নয়, অকারণ আক্রমণও নয়। যা মনে হচ্ছে, তাই লিখুন।

শুধু যে নতুন বই নিয়েই আলোচনা, এমন নয়। বইটি হয়ত পাঁচ বছর আগের, কিন্তু আপনি নতুন কিনলেন, নতুন পড়লেন। সেই অভিজ্ঞতাও উঠে আসতে পারে। সার্বিকভাবে বইমেলার নানা গল্প ও অভিজ্ঞতাও উঠে আসতে পারে। আপনার লেখা পাঠিয়ে দিন বেঙ্গল টাইমসের ঠিকানায়।

bengaltimes.in@gmail.com

# মেজাজটাই তো আসল রাজা, তিনি বাঁচেন নিজের মর্জিতেই

অজয় নন্দী

তিনি কোথায়? কেউই ঠিকঠাক জানেন না। না জানেন নির্বাচকরা। না জানেন বোর্ডকর্তারা। অন্তত জানলেও সরকারিভাবে কেউ স্বীকার করছেন না। কিন্তু তিনি প্রথম দুটি টেস্টে খেললেন না। আচ্ছা, পরের তিন টেস্টে কি খেলবেন? না বলতে পারছেন অধিনায়ক না বলতে পারছেন কোচ। আর নির্বাচকরাও বলার মতো জায়গায় নেই।

তিনি আসলে আছেনটা কোথায়? এমনিতে নানা সময় প্রচুর ছবি ছাড়েন। বোঝা যায়, কোথায় আছেন, কী করছেন। কিন্তু শেষ কয়েকদিন সোশ্যাল মিডিয়াতেও তিনি নেই। কোথায় আছেন, তার কোনও আপডেট দিচ্ছেন না। তার মানে কিছুটা স্বেচ্ছা নির্বাসনে।

তিনি বিরাট কোহলি। আর দশজনের সঙ্গে তাঁর মিল খুঁজতে যাবেন না। তিনি বাঁচেন নিজের শর্তে। তাঁর ইচ্ছে হলে, তিনি

খেলবেন। তাঁর ইচ্ছে না হলে, তিনি খেলবেন না। তাঁর কি চোট? তিনি কি ছুটি কাটাতে বাইরে কোথাও গেছেন? তিনি কি ফের বাবা হতে চলেছেন? জল্পনা চলছেই। আর তিনি সেই জল্পনাকে দিব্যি জিইয়ে রেখেছেন।

আপনার মনে হতেই পারে, বিরাট কোহলি মানে কি আইনের উর্ধ্বে! অন্য কেউ হলে এতক্ষণ শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে হয়তো শাস্তি হয়ে যেত। নইলে অলিখিতভাবে ব্রাত্য হয়ে যেতেন। কিন্তু তাঁকে বাদ দেওয়াও যাবে না। যেদিন খেলতে চাইবেন, সসম্মানে দলে নিতে হবে। বলা যায়, তিনি যেটা চাইবেন, নির্বাচকদের সেই ইচ্ছেকেই মেনে নিতে হবে।

মাস চারেক পরেই তো টি২০ বিশ্বকাপ। আচ্ছা, তিনি কি খেলবেন? উত্তরটা কারও কাছেই স্পষ্ট নয়। ২০২২ টি২০ বিশ্বকাপের পর থেকেই এই ঘরানায় তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না। ভারত মূলত জুনিয়রদের নিয়েই দল গড়ছে। সেখানে বিরাট কোহলি বা রোহিত শর্মাদের দেখা যাচ্ছে না। অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন, বিরাট-রোহিতদের বাদ দিয়েই ভারত হয়তো খেলতে নামবে।

কিন্তু গত কয়েক মাসে ছবিটা বোধ হয় একটু বদলেছে। যে বিরাট ফেলে আসা বছরে একটি টি২০ ম্যাচও খেলেননি, তাঁকে কিনা আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলতে নামিয়ে দেওয়া হল! তার মানে, টি২০ বিশ্বকাপের

ভাবনায় ফের কি তিনি ঢুকে পড়েছেন! আসলে, বিরাটের ট্রফি ক্যাবিনেটে টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের কোনও মেডেল নেই। ধোনির নেতৃত্বে যেবার টি২০ বিশ্বকাপ এল, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় তখনও তাঁর পা পড়েনি। তারপর দীর্ঘদিন খেলেছেন, নিজে অধিনায়কও ছিলেন। কিন্তু অধরা মাধুরী আর ধরা দেয়নি।

যাই হোক, আবার সেই জল্পনায় ফেরা যাক। তিনি তাহলে কোথায়? বোর্ডই বা এমন ধোঁয়াশায় রেখেছে কেন? এর মাঝে এবি ডিভিলিয়ার্স দুম করে বলে বসলেন, বিরাট দ্বিতীয়বার বাবা হতে চলেছেন। বিরাট নিজেই নাকি তাঁকে জানিয়েছেন। দু'দিন যেতে না যেতেই মোক্ষম ডিগবাজি। বলা যায়, কান মুলে ভুল স্বীকার। মোদ্দা কথা, আমার এমনটা বলা উচিত হয়নি।

রান পান বা না পান, ফোকাস তাঁর দিকে। তিনি অধিনায়ক থাকুন বা না থাকুন, চর্চা সেই তাঁকে ঘিরেই। স্বদেশি হোন বা ভিনদেশি, বর্তমান হোন বা প্রাক্তন, তাঁর গুণগান গেয়ে যেতেই হবে। সে আপনার পছন্দ হোক বা না হোক। একটু বেসুরো গাইলেই ট্রোলবাহিনী আপনার জীবন ঝালাপালা করে দেবে। এই ব্যাপারে বিজেপির আইটি সেল আর বিরাটের ট্রোলবাহিনীর মধ্যে তেমন ফারাক নেই।

কিন্তু মুদ্রার একটা অন্য দিকও তো আছে। দেশের মাটিতে পাঁচটা টেস্ট। তার মানে প্রায় দশটা ইনিংস। এর মধ্যে দু-তিনটে সেঞ্চুরি আসতেই পারত। তার মানে, তিনি দুটো বা তিনটে সেঞ্চুরি হাতছাড়া করলেন। সর্বাধিক শতরানের রেকর্ড যিনি তাড়া করছেন, তার কাছে দু-তিনটে সেঞ্চুরি হাতছাড়া হওয়া মানে অনেকটাই পিছিয়ে যাওয়া। পরিবারের পাশে দাঁড়াতে গিয়ে কজন পারতেন এভাবে হেলায় গোটা তিনেশ শতরান আর অন্তত ৫০০-৬০০ টেস্ট রানকে ফেলে আসতে!

আপনার পছন্দ হোক বা না হোক। মেজাজটাই যে আসল রাজা। তিনি বাঁচেন রাজার মতোই। তিনি বাঁচেন নিজের মর্জিতে।

হঠাৎ, ডিভিলিয়ার্স এভাবে সুর বদল করতে গেলেন কেন? হতেই পারে, বিরাটের বাবা হওয়ার যে সম্ভাবনার কথা বলেছেন, সেটা ঠিক সত্যি নয়। অথবা, খবরটা সত্যি। কিন্তু ডিভিলিয়ার্স বাইরে ফাঁস করে দেওয়ায় বিরাট ক্ষুব্ধ। হয়তো বলেছেন, আমার ব্যক্তিগত জীবনের কথা তোমাকে বাহাদুরি করে কে বলতে বলেছে! আর বিরাট চটলে কী হতে পারে, বেশ ভালই বোঝেন আরসিবি-র সতীর্থ। হয়তো আইপিএলের আঙিনা থেকেই ছিটকে যাবেন।

কোনও সন্দেহ নেই, শচীন পরবর্তী যুগে স্টারডমের নিরিখে তিনিই এক নম্বরে।

# বেঙ্গল টাইমস

## ১৪ ফেব্রুয়ারি সংখ্যা

- সরস্বতীর নস্টালজিয়া
- বিকল্পের কোনও পরিশ্রম নেই
- বিরাট চলেন নিজের মর্জিতে
- ক্যাবিনেটেই নেই অর্থমন্ত্রী!

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬।
ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন ২৪৪৫ ৫৬৫৭, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী